সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০১৪

৩১ মার্চ ২০১৪ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির হাত থেকে প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামানের পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ

৩ এপ্রিল ২০১৪ ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সচিব জনাব মনোয়ার ইসলামের বক্তব্য প্রদান। পাশে ভারতের বিদ্যুৎ সচিব শ্রী প্রদীপ কুমার সিনহা ও ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

২৯ মার্চ ২০১৪ ঢাকার রূপসী বাংলা হোটেলে 'বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ: সুযোগ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

২৭ মার্চ ২০১৪ গোপালগঞ্জের ভাঙ্গার হাটে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তীর কাজী মন্টু কলেজের দ্বিতল ছাত্রীনিবাসের উদ্বোধন

২৪ মার্চ ২০১৪ ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে ভারতের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের উপর কর্মশালায় ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কোরাইশির বক্তব্য প্রদান

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ একচল্লিশ । সংখ্যা ০১ । চৈত্র-বৈশাখ ১৪২০-'২১ । এপ্রিল ২০১৪

সাউফেস্ট ॥ প্রথম পার্থ

শান্তিনিকেতন

সূচিপত্র

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ প্রত্নউত্তরাধিকার ০৪

নিবন্ধ: শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ০৭

বিশেষ রচনা: একটি গাছ ও তিনি ১১

সৌহার্দ: সাউফেস্ট ॥ প্রথম পার্থ ১৪

ছোটগল্প: সাঁঝবাতির আলোআঁধারি ১৬

ভ্রমণ: শান্তিনিকেতন– শান্তির আশ্রয়নিকেতন ২০

কবিতা ২৪

অনুবাদ গল্প: রাজমাতা ২৬

উপন্যাস: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩১

শিল্পকলা: রিয়াজ কোমু ৩৭

উৎসব: গানের ভেলায় বেলা অবেলায় ৪০

ছোটগল্প: রাবেয়া ৪৪

শেষ পাতা: খুশবন্ত সিং ৪৮

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ প্রত্নউত্তরাধিকার

বিক্রমপুর একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ। সুদূর অতীতে বিক্রমপুর ছিল বঙ্গ ও সমতট অঞ্চলের রাজধানী। প্রাচীন তাম্রলিপিতে একে 'শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জায় স্কন্ধাবারাৎ' অর্থাৎ ভিক্টরি ক্যাম্প হিসেবে এবং কোন কোন লিপিতে 'শ্রীবিক্রমমণিপুর' হিসেবে উলেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রমপুর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উপমহাদেশের একটি পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রধলেশ্বরীইছামতি বিধৌত নিম্নাঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বিক্রমপুর নানা ধর্ম, নানা সভ্যতার পাদপীঠ হতে পেরেছে। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছে। গড়ে তুলেছে উন্নত সভ্যতা।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের f page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের f একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা *ভারত বিচিত্রায়* মো. দিদারুল আলমের 'স্বামী বিবেকানন্দ: মানবতাবাদী দার্শনিক' শিরোনামে লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। জনাব আলম স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে আসার একটি সময়োচিত দায়িত্বও পালন করেছেন বলে মনে হল। ১৯৭১ সাল থেকে ঢাকার গোপীবাগস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে প্রতিবছরই শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির অংশগ্রহণে যে-সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হত তা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। তাঁদের মধ্যে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহীমের সঙ্গে বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সাহেবকেও বক্তব্য রাখতে দেখেছি, শুধু তাই নয় ফুরফুরা শরিফের শ্রদ্ধেয় পীরসাহেবকেও বক্তব্য রাখতে দেখেছি।

শুধু কি তাই, ঢাকার নবাব আহসানুলাহ সাহেবের নামে রামকৃষ্ণ মিশনের রসুইঘরটি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি মনে পড়ে। এছাড়া বাংলাদেশের নির্ভীক মসীযোদ্ধা এবং বহু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব আবেদ খানের 'আমার ফেরারি সময়' নামে একটি লেখায় (*ভারত বিচিত্রা* অক্টোবর-নভেম্বর ২০১১) ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে ১৯৪৯ সালের কুমারী পূজায় তাঁর শ্রীমণ্ডিত বড় বোনকে কুমারী হিসাবে পূজা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া পুরনো ঢাকার বসুবাজার লেন ও গুরুদাস সরকার লেনের দুর্গাপুজায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যেত। মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে স্বামীজীর মানবতাবাদী দর্শনের আলোকে শিবজ্ঞানে জীব সেবার উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা হত। এই মানসিকতা একটা উদার বাতাবরণ সৃষ্টিতে যেমন সহায়ক ভূমিকা রাখত তেমনি সকল ধর্মমতের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে বিশ্বমানবতার প্রতি 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' কথাটির বাস্তবতাও প্রতিভাত হত।

মূলত ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মমত বলে ঘোষণা করা কিন্তু স্বামীজী তাঁর বক্তব্যে সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বললেন যে, সকল ধর্মমতের মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শনলাভ সম্ভব। আর তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর ধর্মীয় উদারতার মতবাদটির প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হোসেনুর রহমান সাহেবের বক্তব্যে শুনেছিলাম যে, ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রে স্বামীজীর শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের 'যত মত তত পথে'র বক্তব্যের আলোকে উদার গঠনতান্ত্রিক আদর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বামীজী মাত্র ৩৯ বৎসরকাল বেঁচে ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরুদেব তাঁর ধর্মপত্নীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে সমগ্র বিশ্বে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছেন। আর রামকৃষ্ণ পার্ষদদের একত্রে রাখার জন্য স্বামীজী সারদা দেবীকে বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পরে সারদা দেবী তাঁর গঠনমূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পার্ষদদের সঙ্গে মার্গারেট নোবল, সারা সি বুল ও অন্যান্য বিদুষী মহিলাদের নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আর্ত ও বিপন্ন মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাই আজও সমগ্র বিশ্বে স্বামীজীর সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বেলুড় মঠে আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত *উদ্বোধন* পত্রিকাটি আজও অব্যাহত-ভাবে মানুষের পারমার্থিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করে চলেছে দেখে গর্ব বোধ করি। তবে স্বামীজী ধর্মকে বাদ দিয়ে কখনও মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেননি। বিংশ শতাব্দীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা, আবার একই শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন যেমন দেখেছি তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চিন ও পৃথিবীর বহু দেশে লাল ঝাণ্ডার বাড়-বাড়ন্তও লক্ষ্য করেছি।

আজও মনে পড়ে, অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে স্বামীজীর 'হে ভারত ভুলিও না দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই' শিরোনামে একটা লেখা পড়েছিলাম। তখনও বলশেভিক বিপব রাশিয়ায় হয়নি। তবে কি স্বামীজী কার্ল মার্কসের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন? তাঁর এক সহোদর মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে জানি। রাজনীতি স্বামীজী করতেন না। তবুও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। আজকের পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা, নৈরাজ্য ও নারীর সম্ভ্রমহানির মহোৎসব চলছে, তার থেকে উত্তরণের জন্য কি স্বামীজীর ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক দর্শনই একমাত্র পথ?

সমীররঞ্জন শীল
নিকেতন আবাসিক এলাকা
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

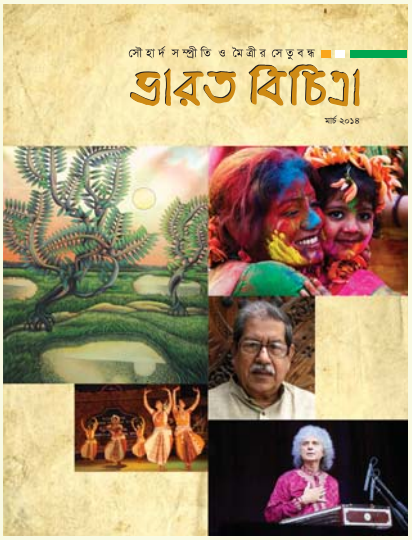

অসম্ভব সুন্দর

ভারত বিচিত্রা-এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যায় মোহন কল্পনার *রুদ্ধপথ* নামে একটি গল্প বেরিয়েছে। মোহন কল্পনা সিন্ধি ভাষার প্রখ্যাত গল্পকার, নাট্যকার, কবি এবং সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর নামটাই আমার জানা ছিল না। অসম্ভব সুন্দর গল্প এই *রুদ্ধপথ*। মনে হয় বহুদিন পর একটা ভাল গল্প পড়লাম। এই না হলে লেখা! নিপাট জীবন থেকে নেয়া– বিশুদ্ধ চারণসাহিত্যের লেখকের শুধু নয় এই গল্পে তিনি একজন প্রকৃত মানুষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দশ আঙুল দিয়ে জাতপাতের বৈষম্যকে তীব্রভাবে দেখিয়েছেন। গল্পটি পড়ে একটা কমপি-মন্ট পাঠানোর ইচ্ছে হল– তাই এই লেখা। গল্পকারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনুবাদক এবং *ভারত বিচিত্রাকে*। *ভারত বিচিত্রার* মাধ্যমে মোহন কল্পনার আরো গল্পের স্বাদ পেতে চাই– এই প্রত্যাশা করছি।

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া
একাউন্টস অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে
সিআরবি, চট্টগ্রাম

আগ্রহী

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের দ্বীপ-উপজেলা মহেশখালীতে অবস্থিত *স্বপ্নালয়* মহেশখালী পৌরসভা সদরের একটি সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা *ভারত বিচিত্রার* গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশাল ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির নিত্যনতুন তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে আগ্রহী।

দিলীপ দাশ
সভাপতি, 'স্বপ্নালয়' সামাজিক সংগঠন
গোরকঘাটা, মহেশখালী পৌরসভা, কক্সবাজার

সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগেও প্রকৃতি ছিল স্নিগ্ধ, প্রসন্ন, আত্মমগ্ন– আপনাতে আপনি বিভোর। গাছেগা ছে পাতায়পাতায় প্ াণের উদ্ভাস, ফুলেফু লে মধুপের মধুগুঞ্জরণ। বাতাসে উৎসবের আমেজ, কোন্ দূরের বনে পাগলপারা কোকিলের কুহুতানে বসন্তের আগমন ধ্বনিত হয়। শিমুলেপলা শে- কৃষ্ণচূড়ায় আগুনের লেলিহান শিখা। এত আলো, এত গান, এত হাসি, এত রঙ যে বসন্তের, তারও রেশ যেন চকিতচরণ চপলহরণ। প ৎখর তপনতাপে ক্রমে উষ্ণ হতে থাকে পৃথিবী– প্রাণপ্রকৃতিতেও ক্রমে রন্নক্ষতা জমতে থাকে। সেই প্রসন্নআত ্মমগ্ন প্রকৃতি যেন কার অভিশাপে রুদ্রভয়াল হয়ে উঠতে থাকে। মাঠঘাট ফেটে চৌচির। তৃষ্ণার জলের জন্যে আকুতি। মেঘবিহীন খরবৈশাখে তৃষায় কাতর চাতক ডাকে– এসো এসো তৃষ্ণার জল এসো। তারপর ঈষাণ কোণে মেঘের সঞ্চার হয়। দামাল মৌসুমি হাওয়ায় ভেসে ভেসে আরও আরও মেঘ জমে আকাশের কোণে– যেন মেঘের পাহাড়! ধূসরপাটলকয়লা কা লো– নানা রঙের মেঘ– মেঘের অনেক রঙ। আরও আরও রোদগর মে সেই পুঞ্জীভূত মেঘমালা হাওয়ার গাড়িতে চেপে ঠিক সন্ধ্যেবেলায় যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে, আছড়ে পড়ে আমাদের মাটির ঘরের চৌচালায়। আম গাছের ডালে ডালে বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। কালবোশেখীর সেই মাতমে তাপিতকুপিত ধরিত্রীমাতা স্নাত স্নিগ্ধপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন আবার।

সুবাবাংলায় নতুন বছ রের সূচনামাস হিসেবে বৈশাখের প্রবর্তন হয়েছিল খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে । সবে ফসল ঘরে তুলেছে কৃষক; সংবৎসরের আহারের সংস্থান নিশ্চিত। হাতে কিছু টাকাকড়ি আ ছে, ফলে সম্রাটের খাজনা আদায়ের এইই তো মোক্ষম সময়। এসব ভেবেই বৈশাখ এল দিনপঞ্জির প্রথম কাতারে। বৈশাখেই হালখাতা– বিগত বছরের দেনাপাওনা মিটি য়ে নতুন বছরের খেরোখাতা খোলা...

রুদ্র বৈশাখ, নিষ্ঠুর বৈশাখ বাংলায় যখন বৈশাখ, ইংরেজি কালপঞ্জিতে তখন এপ্রিল। কোন এক ইংরেজ কবি বলেছিলেন 'এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার'। এই এপ্রিলে আমরা হারিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস রামানুজন, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদারের মত বিশ্বমানের সাহিত্যিকঅংকবিদচলি চ্চত্রকারকে। কিন্তু মৃত্যু সালতামামি আমাদের কাজ নয়, বরং জন্মেরই শুভক্ষণ পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই। এই মাসে জন্মেছিলেন আমাদের বাংলা সিনেমার প্রিয় নায়িকা সুচিত্রা সেন, কবি অমিয় চক্রবর্তী, রূপকথার জাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। এমা সেই জন্মেছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এই মাসেই।

দেখতে দেখতে *ভারত বিচিত্রা* একচলিশ বছরে পদার্পণ করল। একটি সাময়িকপত্রের জীবনে এটি বড় কম সময় নয়। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে *ভারত বিচিত্রা*র অগণিত পাঠকগ্ াহক-শুভানুধ্যায়ীকে অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে জানাই বাংলা নতুন বছর ১৪২১-এর শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। নতুন বছর সবার জন্য সুখশান্তি আর সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরনের মুন্সিগঞ্জের রামপালের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রক্ষিত বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিরীক্ষণ

ঐতিহ্য

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ প্রত্নউত্তরাধিকার

সম্প্রতি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন বিক্রমপুরের বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিদর্শন করেন। অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক নূহ উল্লআলম লেনিন এবং গবেষণা পরিচালক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান তাঁকে বিভিন্ন খনন কার্য ঘুরিয়ে দেখান এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পরে তিনি মুন্সিগঞ্জের রামপালে অবস্থিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রক্ষিত বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিরীক্ষণ করেন।

বিক্রমপুর একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ। সুদূর অতীতে বিক্রমপুর ছিল বঙ্গ ও সমতট অঞ্চলের রাজধানী। প্রাচীন তাম্রলিপিতে একে 'শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জায় স্কন্ধাবারাৎ' অর্থাৎ ভিক্টরি ক্যাম্প হিসেবে এবং কোন কোন লিপিতে 'শ্রীবিক্রমমণিপুর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে ভিক্টরি ক্যাম্প আর রাজধানী সমার্থক ছিল। এক সময়ের 'বিক্রমপুর ভুক্তি' মোগল আমলে সুবাহ বাঙ্গালার একটি 'পরগণা' হিসেবে গণ্য হত। মোগল আমলে বিক্রমপুর পূর্বে মেঘনা ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে পদ্মা নদী ও মানিকগঞ্জের হরিরামপুর, উত্তরে বুড়িগঙ্গা কেরানীগঞ্জ সাভার এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উনিশ শতকেও উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর হিসেবে এই জনপদটি পরিচিত ছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে পদ্মা নদী গতিপথ পরিবর্তন করায় উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ৫টি উপজেলাই (উত্তর বিক্রমপুর) কেবল 'বিক্রমপুর' পরিচয় বহন করছে।

প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রমপুর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উপমহাদেশের একটি পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্রধৌত লেশ্বরীইছামতি বিধৌত নিম্নাঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বিক্রমপুর নানা ধর্ম, নানা সভ্যতার পাদপীঠ হতে পেরেছে। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছে। গড়ে তুলেছে উন্নত সভ্যতা।

অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, বিক্রমপুরের উন্নত সভ্যতার প্রায় সকল প্রত্ননিদর্শন কীর্তিনাশা পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত কোন অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন না করেই এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা হয়েছে।

কোন গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়াই গত দেড়শো বছরে বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তাম্রপত্র, শিলালিপি, পাথর, ধাতব ও কাঠের বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। মজা পুকুর খনন, জমিতে হালচাষ এবং অন্যান্য কারণে মাটি কাটলেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু। বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্য, তাম্রলিপিসহ অন্যান্য প্রত্নবস্তু বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র জাদুঘর, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং পৃথিবীর অনেক জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রাচীন ও প্রাক্কমধ্যযুগের চন্দ্র, বর্মণ এবং সেন রাজবংশ এবং মধ্যযুগে সুলতানি আমল, বারো ভূঞাদের সময়কালের এবং মোগল আমলের প্রত্ননিদর্শন ও তাম্রলিপি সাক্ষ্য দেয় যে, এখানে সমৃদ্ধ এক মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ায় আমাদের কাছে দৃশ্যমান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুলতানি আমলে বাবা আদম শহীদের মসজিদ, মোগল আমলের ইদ্রাকপুর দুর্গ, মীরকাদিমের পুল এবং ব্রিটিশ আমলের দৃষ্টিনন্দন সোনারং মন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্যামসিদ্ধির সুউচ্চ মঠ, টঙ্গিবাড়ী মঠ ও নগর কসবার প্রাসাদগুলো এখনো দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বিক্রমপুরে প্রাচীন ও প্রাক্কমধ্যযুগের উন্নত নগর সভ্যতার ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও অতীতে এ অঞ্চলে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, অনুসন্ধান ও খননের উদ্যোগ ছিল না। ঢাকা জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা নলিনীকান্ত ভট্টশালী টঙ্গিবাড়ীতে গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের সূচনায় একবার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের উদ্যোগ নিয়েও তা এগিয়ে নিতে পারেননি।

বস্তুত ভট্টশালী মহাশয়ের উদ্যোগের ৮০ বছর পর *অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন* ২০১০ সালে এ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়। সংগঠনটি বিক্রমপুরের ইতিহাস্ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানানুশীলন, বহুমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংগঠনটি ইতোমধ্যে শ্রীনগরের বালাসুর গ্রামে বিক্রমপুর জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, নৌ জাদুঘর ও পান্থশালা এবং মুন্সিগঞ্জ শহরের মালপাড়ায় একটি সমাজ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিক্রমপুর জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভবন উদ্বোধন, পান্থশালা এবং রঘুরামপুরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের সংরক্ষণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

উয়াল্লিব টেশ্বরে বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরসভ্যতার আবিষ্কারক খ্যাতিমান প্রত্নতত্ত্ব গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান *ঐতিহ্য অন্বেষণ*এর কর্ণধার অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে বিক্রমপুরে গবেষণা ও খনন কাজে *ঐতিহ্য অন্বেষণে*র গবেষক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করছেন। প্রথম বছর ২০১০ সালে রামপাল ও বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের তিনটি গ্রামে ৯টি পরীক্ষামূলক উৎখনন পরিচালিত হয়। প্রতিটি প্রত্নস্থানে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হলেও সীমিত আকারের খননকাজে বসতির প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছিল না। প্রথম বছর ৯ নম্বর স্পট প্রাচীন বজ্রযোগিনীর রঘুরামপুরে ইট্টনির্মিত একটি দেয়ালের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়। ২০১১ সালে রঘুরামপুরে পুনরায় খনন শুরু হয়। মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা প্রত্নবস্তু শনাক্ত করার আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় প্রত্নবস্তু আবিষ্কারে অনুমানভিত্তিক অনুসন্ধান ও খনন কাজ চালাতে হচ্ছে।

২০১৩এ শুরু করে গত তিন বছরের ধারাবাহিক খনন ও গবেষণার শ্রমসাধ্য সাধনায় আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বৌদ্ধ বিহার। এ পর্যন্ত মাটির নীচে চাপাপড়া বৌদ্ধ বিহারটির পাঁচটি ভিক্ষু কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে। ভিক্ষু কক্ষগুলোর পরিমাপ ৩.৫ মিটার x ৩.৫ মিটার। চাপাপড়া বিহারটির স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বিহারটির একটি দেয়াল উত্তর দিকে, আরেকটি দেয়াল পশ্চিম দিকে ধাবমান। বিক্রমপুর অঞ্চলে আনুমানিক অষ্টমনবম শতাব্দীর অর্থাৎ ১২০০ বছর

আগের একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। এই অমূল্য আবিষ্কারটি বিক্রমপুরকে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের ইতিহাসে নতুন করে জায়গা করে দেবে।

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর কীর্তিমান সন্তান ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮৭১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার নালন্দায় অধ্যয়ন করেন। অতীশ দীপঙ্কর অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁকে বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। কথিত আছে, তিনি কিছুদিন সোমপুর মহাবিহারেরও (পাহাড়পুর বিহার) অধ্যক্ষ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়রোধে রাজা চং ছপের বিশেষ আমন্ত্রণে অতীশ তিব্বত ও চিনে গমন করেন। সেখানে ১৬ বছর অবস্থানকালে তিনি ১৭৫টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। *শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্রালংকার, জাতকমালা, উদ্যানবর্গ, বোধিসত্ত্ব ভূমি* প্রভৃতি তাঁর বিশুদ্ধ মহাযানী দর্শন গ্রন্থ। তিব্বতীরা তাঁকে সম্মানসূচক হ্লো বো জে অর্থাৎ দ্বিতীয় বুদ্ধ, ভারতবর্ষ ধর্মপাল ও গোটা বিশ্বের বৌদ্ধসম্প্রদায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ উপাধি প্রদান করেছিল। অতীশ দীপঙ্করের বাল্যনাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। মাত্র কৈশোর অতিক্রমের পরই যিনি একদা বৌদ্ধবিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভন্তের স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি বর্তমানে নিজ গ্রামে অবহেলিত, শেকড় ছিন্ন। চিন সরকার সম্প্রতি বজ্রযোগিনী গ্রামে তার স্মরণে একটি স্মারক স্থাপন করেছে। চিনা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা স্মারকে বলা হয়েছে যে, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০০০ বছর আগে চিনে শুধু বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার করেননি; তিনি চিনে বাংলার সেচ ও কৃষি ব্যবস্থা এবং ঔষধ প্রযুক্তি প্রচলন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে গৌতম বুদ্ধের পরই অতীশ দীপঙ্করের স্থান। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। প্রশ্ন জাগে, বাল্যজীবনে তিনি কোথায় শিক্ষাগ্রহণ এবং বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা নেন? বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর পা-ত্যলাভ তো একদিনে সম্ভব হয়নি!

সদ্য আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল বলে আমাদের ধারণা। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, মগধের পূর্বে বাংলায় 'বিক্রমপুরী' নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। পূর্ব ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমপুরী বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবত পালসম্রাট ধর্ম পাল। কারও কারও মতে, বিক্রমপুরী বিহার বিকাশে চন্দ্র রাজাদেরও অবদান ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পালসম্রাট ধর্ম পাল প্রায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সোমপুর মহাবিহার, বিক্রমশীল মহাবিহার, নালন্দা মহাবিহার তাঁর অন্যতম কীর্তি। অন্যদিকে চন্দ্রবংশীয় রাজারা সমতটের শাসক ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতটে ৩০টি বৌদ্ধ বিহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সমতটে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ইতোমধ্যে আটটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বলা হয়, বিক্রমপুর একসময় সমতটের রাজধানী ছিল, তাই বিক্রমপুরে বৌদ্ধ বিহার থাকাই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও খননে বিক্রমপুরী বিহারের আশপাশে একাধিক বৌদ্ধ বিহার থাকার ইঙ্গিত মিলছে, যা অনেকটা নালন্দা বিহারের মত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীসহ খ্যাতিমান পণ্ডিতদের মতে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের ফলে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের কাজ এগিয়ে নেওয়া গেলে বিক্রমপুর বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তীর্থকেন্দ্র এবং পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে। রামপাল ও বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে ইতোমধ্যে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রায় পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের কালো পাথরের একটি অক্ষত বৌদ্ধ দেবী মূর্তি, একটি প্রাচীন নৌকা, দারু (কাঠ) ভাস্কর্য, কাঠের অলঙ্কৃত স্তম্ভ, বেশ কিছু টেরাকোটা ও মৃৎপাত্র। অনুসন্ধান, গবেষণা ও উৎখনন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে গেলে বিক্রমপুর অঞ্চলে কেবল একাধিক বৌদ্ধ বিহারই নয়, উন্নত নগরসভ্যতার স্থাপত্য নির্দশনও আবিষ্কৃত হবে। মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা ও টঙ্গিবাড়ী উপজেলার যেসব গ্রামজনপদ প্রাচীন সমতট ও বঙ্গের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত, সেসব এলাকায় পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত খনন ও অনুসন্ধান অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বিক্রমপুরের অজানা ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে।

সূত্র **অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন**

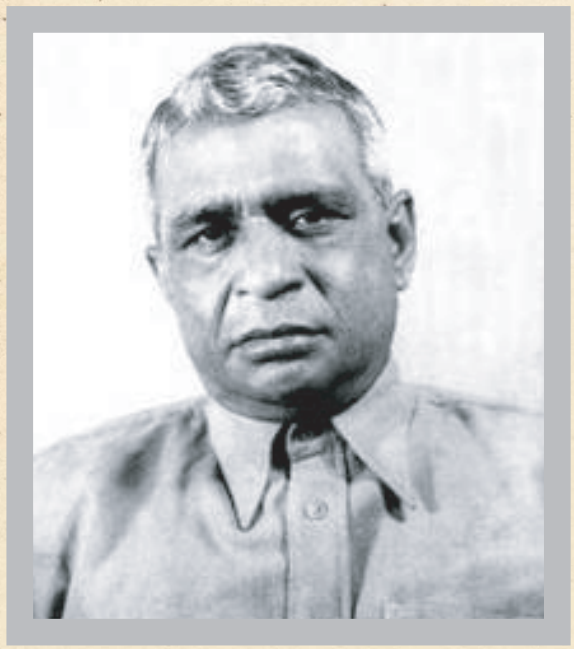

নিবন্ধ

শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষা-আন্দোলনের এক বিস্মৃত পদাতিক

জ্যোতির্ময় দাশ

পূর্ব বাংলার (একদা পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ) ভাষাআ ন্দোলন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন মাত্রায় দানা বাঁধে এবং সে আন্দোলনে শরিক ছিলেন অনেকেই। বহু ছাত্রনেতা ভাষা আন্দোলনে বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আবার তাঁদের সঙ্গে অনেকেই রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালির ভূমিকাতে ছিলেন। রাজনীতির কূটনীতি আর প্রচারের প্রসাদে সেই অকিঞ্চিৎকর কাঠবিড়ালিদের অনেকে বীরপূজা যেমন ভোগ করেছেন, তেমন অনেকেই যারা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত পথিকৃৎ ছিলেন– তাদের কথা আমরা স্মরণে রাখিনি। শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬১৯৭১) সেই পথিকৃৎদের একজন, যাঁর কথা আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ তরুণ জব্বর, বরকত, রফিক, সালাম আর শফিকদের সঙ্গে ঢাকার রাজপথে ছিলেন না। তিনি শহিদ হয়েছিলেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই সুবর্ণ মুহূর্তে, যখন তাঁর নিজের হাতে জ্বেলে দেওয়া ভাষাআ ন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ দাবানল হয়ে উঠে ফ্যাসিবাদী পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর অত্যাচার আর নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করার প্রায় চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজশাসিত অবিভ ক্ত ভারতের এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। অধুনা বাংলাদেশের কুমিলা-জেলার রামরাইল গ্রামে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে) ২ নভেম্বর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী ৮৫ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জন্মভূমির বন্ধন বহু ঝড় ঝাপ্টাতেও ছিন্ন করে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে রাজি হননি। অবশ্য তাঁর জীবনের শেষ দিনটি অথবা তাঁর মৃত্যুর সঠিক পরিস্থিতিটি আমাদের অজানা– বাংলাদেশের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে প্রতিবাদী ছাত্রজনতা

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ২৭ মার্চ (১৯৭১) রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার রাজাকার সৈন্যরা কুমিল্লা শহরে তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল তাঁরা মনে করেন ৮৫ বছরের বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ধীরেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়– একটি সুচতুর পূর্ব পরিকল্পনা এবং আরও বিশদভাবে বলতে হলে বলা যায় যে তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল ২৩ বছর আগের এক ঘটনার প্রতিশোধ নিতে। সেই মূল নেপথ্য কারণ সন্ধানের আগে গ্রেফতারের ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণআন্দোলনের মুখে আইউব খানের পতন হলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০) আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে– শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই বিজয়ী দলের নেতা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়নি। এই কারণে তিনমাস নানা প্রতিবাদ ও শান্তিপূর্ণ মিছিলমিটিং হয়, কিন্তু তাতেও কোনও ফল না হওয়ায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১-৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণবিক্ষোভ চলে। ৭ মার্চ ১৯৭১ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৫ মার্চ ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গিশাহীর হুমকির জবাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করার কথা প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেন। পরের দিন থেকে নির্মম জঙ্গি নিষ্পেষণ শুরু হয়। ২৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে আটক করে রাখা হয়। কেবলমাত্র শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেই জঙ্গি প্রশাসকেরা শান্ত হল না– তারা বেছে বেছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার এবং হত্যা করতে থাকে। উদ্দেশ্য মুক্তি আন্দোলনকে পঙ্গু ও নেতৃত্বহীন করে দেওয়া। সেই পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের গ্রেফতারের মাত্র দু' দিন পরেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যুবক দিলীপকুমার দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি এবং তাঁর ছেলেই সম্ভবত প্রথম দু'জন হিন্দু শহিদ। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পে বেশ কিছু বাঙালি মনীষী শীর্ষস্থানে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথকে কেন গ্রেফতার করা হল, তার কারণ খুঁজতে হলে আমাদের ২৩ বছর আগের ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে।

ধর্ম, জাতি এবং ভাষা– এই তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে জড়িয়ে ১৯৪৭এ সদ্যগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ রীতিমত পরিকল্পনা করে সেসময়ের পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী নাগরিকদের মনে এক জটিল সংশয়ের ছায়া ফেলেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র ঔপচারিকভাবে গঠিত হবার আগেই ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ প্রথম বাংলা ও উর্দুর মধ্যে একটা সংঘাত বাধিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, ''ভারতে যেমন 'হিন্দি' রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে তেমনই 'উর্দু' রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।'' কিন্তু সংযুক্ত বাংলার বিদগ্ধ মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *দৈনিক আজাদ*এ একটি প্রবন্ধে ড. জিয়াউদ্দিনের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে লেখেন, 'অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। বাংলা রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি পাবার পর যদি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, তখন উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।' এরপরেই পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন তিনটি বিদ্রোহের আকারে জেগে উঠেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র তিন মাসের মধ্যে ১৯৪৭এর ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচি শিক্ষা সম্মেলনে 'উর্দু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। এর প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে প্রথম পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই প্রথম বিদ্রোহের পর ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিশিষ্ট ভূমিকাটি দেখতে পাই। তিনি পাকিস্তান সংসদে (গণপরিষদ) 'উর্দু'কে রাষ্ট্রভাষা ও সংসদে ব্যবহারের একমাত্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাবে তাঁর ঐতিহাসিক সংশোধনী প্রস্তাবে বাংলাকে যুক্ত করার প্রস্তাব রাখেন। ধীরেন্দ্রনাথ একজন সমাজ সচেতন, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ চরিত্রের মানুষ। তিনি এক সংগ্রামী রাজনীতিবিদও ছিলেন এবং জীবনে কখনো কোনও কাজে আপোস করেননি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রিপন

২৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে আটক করে রাখা হয়। কেবলমাত্র শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেই জঙ্গি প্রশাসকেরা শান্ত হল না– তারা বেছে বেছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার এবং হত্যা করতে থাকে। উদ্দেশ্য মুক্তি আন্দোলনকে পঙ্গু ও নেতৃত্বহীন করে দেওয়া। সেই পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের গ্রেফতারের মাত্র দু' দিন পরেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যুবক দিলীপকুমার দত্তকে গ্রেফতার

শেরে বাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রীত্বের শপথ নিচ্ছেন ধীরেন্দ্রনাথ

কলেজ থেকে বি এ এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কুমিলায় ওকালতি শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ওকালতির স্বচ্ছল ও প্রতিষ্ঠিত জীবিকা ছেড়ে কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং দলীয় নেতাদের সঙ্গে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে পুনরায় তাঁকে সাত মাস কারান্তরীণ রাখা হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডাকঘরের সামনে প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি তোলার অপরাধে গ্রেফতার হন এবং দ্বিতীয় দফায় ন'মাস কারাদ- ভোগ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাঁকে পুনরায় কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিধানসভার অধিবেশনে বাজেট আলোচনাকালে তাঁর উত্থাপিত একটি ছাঁটাই প্রস্তাব অধিকসংখ্যক ভোটে গৃহীত হবার ফলে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এই ঘটনাটিকে নাজিমুদ্দিন খোলামনে গ্রহণ করতে পারেননি এবং ধীরেন্দ্রনাথকে যে তিনি কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি সেটা পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হবার পর আমরা ঘটনাপর স্পরায় পরবর্তীকালে দেখতে পাব। ধীরেন্দ্রনাথকে তিনি সেদিন থেকেই চিরকালের জন্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে রাখেন এবং সুযোগমত প্রতিশোধ নিতেও ভোলেননি।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এবং দেশবিভাগের পর হিন্দুমুসলমান দা ঙ্গা ও রাজনৈতিক খুনোখুনিতে পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে উঠলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকেন। কুমিলায় ধীরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশীরাও শহর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে আসতে রাজি হননি। নোয়াখালিতে সে সময়ে গান্ধীজীকে পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত করতে যেতে হয়। এসময়ে প্রদেশ কংগ্রেসও তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে সাময়িকভাবে হলেও ভারতে চলে যেতে অনুরোধ করে তাঁর জীবনাশঙ্কার কথা ভেবে। তিনি সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশভূমি (বিকল্পে মাতৃভূমি) ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন এবং বরাবরের জন্য পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান।

দেশভাগের পর নবগঠিত পাকিস্তানে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হন। এই গণপরিষদে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা বিল প্রসঙ্গে বাংলাভাষার স্বপক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাব রাখেন। সংসদে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন: 'আজ যে সংশোধনী প্রস্তাব আমি সভাকক্ষে রাখছি, আমি মাননীয় সদস্যদের নিঃসংকোচে জানাতে চাই যে, আমি কোনও ধরনের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বশবর্তী হয়ে তা করেছি না। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছে মাননীয় সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা কর ন। সভাপতি স্যার, আমি জানি বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ভাষাটি রাষ্ট্রের সংখাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা। অতএব এটি একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও যেহেতু তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা, সেক্ষেত্রে এই বাংলাভাষার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। আমাদের দেশে যে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ বসবাস করছে তার মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। সেক্ষেত্রে স্যার, আপনিই বলুন আমাদের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত? একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষা ব্যবহার করে সেটিই হওয়া উচিত। স্যার, আমি মনে করি আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান ভাষা হল বাংলা ভাষা।'...

এরপর তিনি কতকগুলি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত তুলে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে দেখাবার চেষ্টা করেন, 'একটি গরীব চাষীর ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে তার ছেলেকে টাকা পাঠাতে গ্রামের পোস্ট অফিস থেকে মানি অর্ডার নিয়ে দেখে সেটি উর্দুতে লেখা, সে তার কিছুই বুঝতে পারে না। ফলে তার টাকা পাঠানো সম্ভব হয় না। যেহেতু ছেলেকে টাকা পাঠানো তার বিশেষ জরুরি, তাকে দূরের শহরে দৌড়তে হয়। মানি অর্ডার ফর্মটি কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে তারপর সে টাকা পাঠাতে পারে। সভাপতি স্যার, সেই গরীব চাষীটি এক টুকরো জমি বিক্রি করল অথবা কিনল। সে সরকারি অফিসে টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ডিউটি স্ট্যাম্প কিনল, কিন্তু সে বুঝতে পারল না সে যে টাকা দিয়েছে সেই দামের স্ট্যাম্প সে পেল কিনা। স ্যার, যেহেতু স্ট্যাম্পের মূল্য বাংলায় লেখা নয়, উর্দু অথবা ইংরেজিতে লেখা, সেক্ষেত্রে তার জানা সম্ভব হল না তাকে সঠিক মূল্যের

সংসদে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন: 'বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ভাষাটি রাষ্ট্রের সংখাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা। অতএব এটি একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও যেহেতু তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা, সেক্ষেত্রে এই বাংলাভাষার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে।... একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষা ব্যবহার করে সেটিই হওয়া উচিত। স্যার, আমি মনে করি আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান ভাষা হল বাংলা ভাষা।'...

স্ট্যাম্প আদৌ দেওয়া হয়েছে কিনা? দেশের সাধারণ মানুষকে এই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দেশের রাষ্ট্রভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে দেশের সাধারণ মানুষ সে ভাষা বুঝতে পারে। দেশের চার কোটি চলিশ লক্ষ সাধারণ মানুষ দেখল যে এই গণপরিষদের, যে পরিষদ অন্য সমস্ত বিধানসভার মধ্যে প্রধান, তার কর্মবিবরণী যে ভাষায় রাখা হচ্ছে সেটা তাদের জানা নেই।... আর্টিকেল ২০-তে ইংরেজিকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, চার কোটি চলিশ লক্ষ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে সে মর্যাদা দেওয়া উচিত।'

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জাতীয় সংসদে ব্যবহারের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও ব্যবহার করার সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান পার্লামেন্টে কেবলমাত্র প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যাঁরা সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন) ছাড়া আর কেউ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাশে দাঁড়াননি। পূর্ব বাংলার (পাকিস্তান) একজন বাঙালি মুসলমান সদস্যও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই যুক্তিসঙ্গত সংশোধনী প্রস্তাবটি সমর্থন করেননি। গণপরিষদে বাঙালি সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বাঙালি মুসলমান সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলার বিরুদ্ধেই রায় দেন। এতদিন পর খাজা নাজিমুদ্দিন বাঙালি হিসেবে নিজের নাক কেটে ধীরেন্দ্রনাথের যাত্রাভঙ্গ করে সম্ভবত ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত বঙ্গীয় বিধানসভায় তাঁর বাজেট প্রস্তাব বাতিলের প্রতিশোধ নিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ হওয়ায় পরের দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি আবার ঢাকায় এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে এবং ক্রমশ ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রক্তক্ষয়ী আত্মাহুতিতে যা বিপর্যয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কিশলয়ই বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের মহীরুহ হয়ে উঠেছিল। বর্তমান রাজনীতিবিদরা মনে করেন যে, সেদিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাভাষাবিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হবার সুযোগ থাকত না। বাংলা ভাষার প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে ধূমায়িত বিক্ষোভের রোষ সুপ্ত ভিসুভিয়াসের মত ফেটে পড়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে নষ্ট করে দেয় যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উত্থান হয় (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) যার রাষ্ট্রভাষা প্রত্যাশামতই হয় বাংলা ভাষা।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ আচরণের জন্য তিনি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তান আইনসভায় নির্বাচিত হন এবং 'গণসমিতি' নামে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে আবু হোসেন ও পরবর্তীকালে আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে আইউব খানের সামরিক সরকার তাঁর ওপর ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার (এবডো) আইন প্রয়োগ করে এবং রাজ্যসভায় তাঁর নির্বাচিত সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারতপাকি স্তান যুদ্ধের সময় তাঁকে ইস্ট পাকিস্তান পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্সে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কয়েক মাস কারারুদ্ধ রাখা হয়। এই সময় থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেন।

শেষ বয়সে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হয়তো সেই অপরাধেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কুনজরে ছিলেন– যার মাশুল তাঁকে পরিণত বয়সে জীবনের বিনিময়ে শোধ করতে হয়েছিল।

আমরা অনেকেই অনেক সময় সামাজিক আচারআচরণ ও নৈতিকতা সম্পর্কে ভাবনাচি ন্তা করি, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় কিছু করা হয়ে ওঠে না– শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা রক্ষার সমর্থনে সোচ্চার হয়ে তাঁর সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতাকে কাজে রূপান্তরিত করার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জ্যোতির্ময় দাশ ভারতের কবি, প্রাবন্ধিক

ভারত সম্পর্কে নিয়মিত জানতে লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

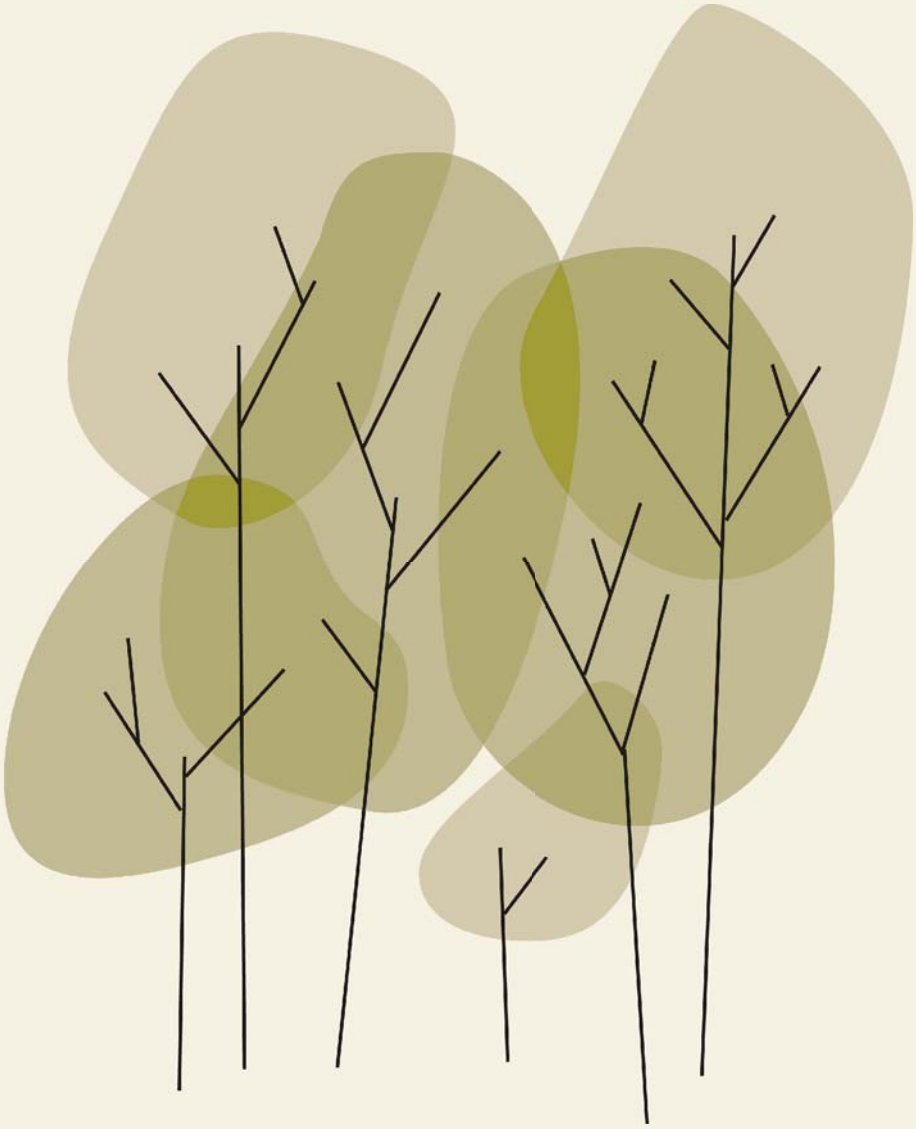

বিশেষ রচনা

একটি গাছ ও তিনি

জাহানারা নওশিন

সোনালি ঝর্নার মত জানলার পাশে মহাশিরিষের পাতাগুলো ঝরে যায় চৈত্রের বাতাসে। সময় ঝরে যায় জীবন থেকে– সোনালি রূপালি বা রঙহীন, বাস্তব অবাস্তব স্বপ্নময় বা স্বপ্নহীন। গাছটির ডালে ডালে এখন একটি একটি করে বিন্দুর মত জেগে ওঠে কিশলয়ের অঙ্কুর যে সকালের অরুণ আলোয় ধীরে ধীরে চোখ মেলবে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মত। তারপর হাত পা মেলে খেলা করবে সূর্যের আলোয়, নাচবে লালচে সবুজ রঙ মেখে মেখে, মিহিন সবুজ ঘনাবে দিনে দিনে। তারপর চকচকে সবুজ পাতার উদাস নাচন লাগবে বৈশাখের রুদ্র দুপুরে, স্নিগ্ধ বিকেলে। সেই বৈশাখের আশায় মহাশিরিষ নিস্তব্ধ পত্রহীন দাঁড়িয়ে নিঝ্‌ঝুম সময় গোনে জানলার বাইরে। ঘরের ভিতরে জানলার শিকে কপাল ঠেকিয়ে তিনিও দাঁড়িয়ে থাকেন। মহাশিরিষের নিস্তব্ধ জাগরণ তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান।

তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে এখন স্থবিরতা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবু তাঁর ভিতরে হামাগুড়ি দেয় এক মহান শিশু যে কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্বউ ত্তীর্ণ এক মহামানব, যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নকে এক করে কেবলই শুধোয়– তার ঠিকানা কি? তিনি এখন আকাশমুখী– নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে বৈশাখের প্রতীক্ষায়, প্রবল একটি ঝড়ের প্রতীক্ষায়, আরও একটি বৎসরের প্রতীক্ষায়।

তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে এখন স্থবিরতা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবু তাঁর ভিতরে হামাগুড়ি দেয় এক মহান শিশু যে কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্ব উত্তীর্ণ এক মহামানব, যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নকে এক করে কেবলই শুধোয়– তার ঠিকানা কি? তিনি এখন আকাশমুখী– নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে বৈশাখের প্রতীক্ষায়, প্রবল একটি ঝড়ের প্রতীক্ষায়, আরও একটি বৎসরের প্রতীক্ষায়। তাঁর স্বপ্নের মধ্যে এখন নির্মেঘ আকাশ এবং চৈত্রের বাতাসে সাদা শুকনো হাড়ের মত রাঢ়ের দুপুর ভেসে ভেসে যায়– একটি দীঘির টলটলে পানি– কালো এবং ঠাণ্ডা, পাকুড়ের মর্মর, তেঁতুলের নিবিড় ছায়া, বাবলার পানসে সবুজ, আকাশছোঁয়া প্রান্তরে শুধুই ধুলোর ঘূর্ণি আর একটি একলা তালগাছ তাঁর স্মৃতিতে পিপাসা এবং আকুলতা জাগায়। স্তব্ধ বাড়ির উঠোনে একটি মুরগির ক্বক ক্বক ডাক এবং চুলোয় ভাত ফোটার বুদবুদ শব্দ সমস্ত নীরবতাকে বিশাল আকারে সম্প্রসারিত করলে এবং তা দিগন্তে মিশে যেতে লাগলে হাঁফ ধরানো গুমোট অন্ধকারের মত এই নিস্তব্ধতা তাঁর গলায় আটকে যায়। তখন কচি নিমপাতার তেতো তেতো গন্ধ আর সবুজ বিন্দুর মত জেগে ওঠা শিশুনিম প্রবল বাতাসে মাথা নুয়ে নুয়ে ধরিত্রীকে প্রণতি জানায়। দূর আকাশের কিনারায় কালো মেঘের পাহাড় জমে উঠলেও সূর্য তখনো চৈত্রের দুপুরে ঝকঝক করে এবং জারুলের মাথায় উজ্জ্বল বেগুনি রঙের উচ্ছ্বাসে রাঢ়ের করালী দুপুর মিলিয়ে যায়। মহাশিরিষ নেচে ওঠে সবুজ পাতার উল্লাসে। নতুন জীবন শুরু করার তুমুল আনন্দে মহাশিরিষ আলিঙ্গন করে সময়কে। সময় বয়ে যায়– মহাশিরিষের শাখায় শাখায় সবুজের ঝর্না বয়ে যায়। পাতায় পাতায় নতুন জীবনের উচ্ছ্বাস। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছ আর সূর্যের খেলা দেখেন এবং জেগে ওঠার বদলে বিবশ হয়ে বসে পড়েন। দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে তিনি ফুঁপিয়ে ওঠেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে পড়েন। তাঁর শরীর থেকে বসন খসে গেলে তিনি নিরাবরণ গাছের মতই দাঁড়িয়ে থাকেন এবং ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে জীর্ণতায় জেগে ওঠা চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সময়ের চিহ্ন মাপেন। সমুদ্রের কোটি কোটি ঢেউ এবং ঘূর্ণি চক্রে চক্রে ঘুরে ঘুরে সময় সমস্ত শরীরকে আবরিত করে তার জাল মেলে দেয়। সেই কুৎসিত জীর্ণতা সমস্ত কোমলতাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়। তিনি অবসন্ন এবং ক্লান্ত হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন পাতাঝরা গাছটির দিকে তাকিয়ে– প্রতি বছর বৈশাখ তাকে দেয় সবুজের সমারোহ, নতুন সৌষ্ঠব, গৌরব, বিকচিত পাতার উল্লাস। সাপেরা খোলস ছাড়ে, পায় নবীন ত্বকের স্নিগ্ধ কোমলতা। গাছও পায় নবীন পাতার উল্লোল উল্লাস। তিনি এখন নিজেকে গুটোতে গুটোতে নিঃশেষে নিজের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন সব কালিমা মুছে দিয়ে তিনি গাছের মতই হেসে ওঠেন। সময়কে সীমিত করে ভাবার জন্যেই তিনি বেশ ফাঁপড়ে পড়েছিলেন। এখন সেই বেষ্টন খুলে যাওয়াতে দেখলেন গাছ এবং তিনি একই রকম। তিনি এবার হৃষ্টমনে জানলার শিক ধরে চৈত্রের বাতাস, পত্রহীন মহাশিরিষ এবং আসন্ন বৈশাখের ঝিম ধরা দুপুর উপভোগ করেন। সময়ের অপঘাত অপচ্ছায়ার মত সব কিছুর ওপর ঝুলে থাকে এবং দাগ ফেলতে ফেলতে চলে যায়– হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। হঠাৎ চমকে উঠে তিনি হেসে ফেলেন। দূরে রাস্তায় তাঁর পৌত্রীকে ছুটে ছুটে বাড়ির দিকে আসতে দেখে মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, 'সময় বয়ে না গেলে ওর বাড়ি ফিরে আসার সময় কি হত?

জাহানারা নওশিন
কবি, কথাকার

ঘটনাপঞ্জি ❖ এপ্রিল

০৩ এপ্রিল ১৯৫৫	❖	গায়ক হরিহরণের জন্ম
০৫ এপ্রিল ২০০৭	❖	লীলা মজুমদারের মৃত্যু
০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্সএর প্রতিষ্ঠা
১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১০ এপ্রিল খ্রি. পূ. ৫৮৯	❖	গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১২ এপ্রিল খ্রি. পূ. ৫৯৯	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর জন্ম
১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তী (বামে)

happy 2014 Coca-Cola

'Coca-Cola', 'Coke', the 'Contour Bottle' and the 'Dynamic Ribbon' are the registered trademarks of The Coca-Cola Company. 'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours.

সৌহার্দ

সাউফেস্ট ২০১৪

সেমন্তী মঞ্জরী

পঞ্জাবের জলন্ধরের লাভলি প্রফেশন্যাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ) এবার আয়োজন করেছিল ২০১৪-এর সাউফেস্ট অনুষ্ঠান। একে আরো বিশাল ব্যাপ্তি দেওয়ার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেকটি অনুষ্ঠান 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এর সঙ্গে এবার সাউফেস্ট ২০১৪-এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রীকে বাছাই করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য। আমার সৌভাগ্য যে, তাদের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে আমার এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংস্কৃতি একসঙ্গে, একই মঞ্চে দেখতে পারার সুন্দর অভিজ্ঞতা ঘটে আমাদের। যেমন নাগপুরের লোক-সংস্কৃতির ঝলক, তেমনি পঞ্জাবের ভাঙড়ার মজা, আবার কোলাপুরের নাচ– সব মিলিয়ে ভীষণ মনোরম হয়েছিল পুরো পরিবেশ। বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা অংশ নিয়েছিলাম, আমরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান যেমন করেছি, তেমনি আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি– আমাদের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে নাচও পরিবেশন করেছি। আমাদের লোকসঙ্গীত শুনে, নাচ দেখে তাঁরাও মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এর অনুষ্ঠানও বেশ সুন্দর হয়েছিল। এখানে শুধু এলপিইউ-এর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক বছর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরে। এর মধ্যেই প্রতিযোগিতা হয় এবং যারা সবচেয়ে ভাল পরিবেশন করতে পারে, তাদের পুরস্কৃত করা হয়। অন্য দেশের সংস্কৃতির নিদর্শন দেখা এবং পরিচিত হওয়া যেমন আনন্দের, তেমনই শিক্ষণীয়। সব মিলিয়ে সাউফেস্ট ২০১৪ আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম।

সেমন্তী মঞ্জরী শিক্ষার্থী, উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পী

কলকাতায় প্রথম পার্থ

তানিয়া হোসেন

থিয়েটার স্কুল প্রতিষ্ঠার দু'বছর পর ১৯৯২ সালে সেখান থেকে উত্তীর্ণ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য *থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনী* নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তখন থেকেই থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনীর পথ চলার শুরু। স্কুলের অধ্যক্ষ রামেন্দু মজুমদারের তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ৭-সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি এটি পরিচালনা করে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিরিন বকুল, ত্রপা মজুমদার, তানভিন সুইটি, গোলাম ফরিদা ছন্দা, তানিয়া হোসেন অভিনয় এবং অন্যরা নির্দেশনা ও নানা সৃষ্টিশীল কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন।

থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনী এ পর্যন্ত দু'টি নাটক প্রযোজনা করেছে। প্রথম প্রযোজনা বিখ্যাত নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটএর *ওয়েটিং ফর গডো* যার বাংলা *গডোর প্রতীক্ষায়* অনুবাদ করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছিলেন আতাউর রহমান। *প্রথম পার্থ* সংগঠনটির দ্বিতীয় প্রযোজনা। নাটকটি রচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু এবং নির্দেশনা দিয়েছেন থিয়েটার স্কুলএর প্রাক্তন ছাত্রী জয়ীতা মহলানবীশ। বাংলার প্রধান পাঁচ কবির অন্যতম নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর এই নাটকটি একটি ধ্রুপদ রচনা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। এ নাটকে উঠে এসেছে মহাভারতে উলেখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বীর কর্ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়তা, প্রেম, ক্রোধ, কুন্তীর আবেদন, দ্রৌপদীর প্ররোচনা এবং কৃষ্ণের কূটনীতি। নাটকের ঘটনাপ্রবাহ বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনী নাটকটি মঞ্চে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

২ মার্চ ২০১৪ কলকাতার সেরিক অফ সাইলেন্স নামের নাট্যদলের আমন্ত্রণে *প্রথম পার্থ* নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয় কলকাতার এক্সিস শপিং মলে। নাটকটি সকলের প্রশংসা লাভ করে।

তানিয়া হোসেন অভিনেত্রী

ছোটগল্প

সাঁঝবাতির আলো-আঁধারি

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘একটা ভূতের গল্প লিখুন না অরুণদা’

‘কেন, তোমাকে হঠাৎ ভূতে পেল কেন?’

‘কি যে বলেন, ভূতে পাবে কেন? আসলে ভূতের গল্প আমার দারুণ লাগে। বেশ কেমন একটা গা-ছমছমে ভাব, আলো-ছায়া রহস্য, লিখুন না একটা।’

‘না, ও আমি পারব না।’

‘কেন পারবেন না অরুণদা? আপনার লেখার আমি কী রকম ভক্ত জানেন না বুঝি? ভক্তদের অনুরোধ একটু রাখতে হয়।’

‘এভাবে বোলো না উমা। ওটা আমার দ্বারা হবে না। ওসব ভূত-টুত আমার আসে না।

‘কেন আসে না অরুণদা?’

‘ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। আমি যা বিশ্বাস করি না তা নিয়ে লিখি না।

‘বলছেন কী! ভূতে বিশ্বাস নেই? আমাদের দেশের বাড়িতে চাঁপাদি নিজের চোখে ভূত দেখেছে।’

অরুণাংশু হাসতে হাসতে বলল, ‘তেনারা গাঁ-গঞ্জে জমিয়ে থাকেন। শহরের আদপ-কায়দা বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই এদিকে তেনাদের আনাগোনা তেমন নেই।’ উমা ওর একতাল কালো চুলে হাত-খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল, ‘গাঁ-গঞ্জ থেকে দু’একটা ভূত শহরে

> কাকা-কাকিমার বিরক্তির একটা বড় কারণ হল উমা। পর পর কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে ভেঙে গেল ওর। কোন পাত্রপক্ষই ওকে পছন্দ করছে না। বেচারির একমাত্র অপরাধ ওকে দেখতে তেমন ভাল নয়।' অরুণাংশু ভাবছিল এই একটা কারণের জন্যেই কি উমাকে ও-ও প্রত্যাখ্যান করছে না মনে মনে?

চলেও তো আসতে পারে। চারপাশে যাদের দেখছেন তাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ভূত হতে পারে। দিনের বেলা মানুষ সেজে থাকে আর রাতের বেলা দাঁতনখ সব বের করে। হতেও তো পারে এমন!' সশব্দে হেসে ওঠে অরুণাংশু। হাসতে হাসতেই বলে, 'বেশ বলেছ কিন্তু কথাটা। তুমিই যে তেমন নও তাই বা কে বলতে পারে?' উমা ভ্রূ কুঁচকে তাকায় অরুণাংশুর দিকে। তন্ময় উমাকে মৃদু ধমক লাগিয়ে বলে, 'কী হচ্ছে উমা! ভূত নিয়ে পড়লি কেন হঠাৎ? *প্রাত্যহিক বার্তায়* অরুণের একটা গল্প বেরিয়েছে গত রবিবার, পড়ে দেখিস।' উমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ও আমার পড়া হয়ে গেছে।' অরুণাংশু কৌতূহলী চোখে তাকায় উমার দিকে, 'কেমন লেগেছে উমা গল্পটা?' উমার কণ্ঠস্বরে হাল্কা মেঘ। বলে, 'আমার কেমন লেগেছে তা জেনে আপনার কী লাভ?' অরুণাংশু বলে, 'বাঃ তুমি একজন সমঝদার পাঠিকা। তোমার মতামত জানতে চাইব না?' উমা আড়চোখে অরুণাংশুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'গল্পটা সত্যি দারুণ হয়েছে, আপনি অসাধারণ। তন্ময় বলে উঠল, 'ও অসাধারণ, নাকি ওর লেখা?' উমা থতমত খেয়ে বলল, 'ওই হল আর কি।'

অবসর পেলেই বাল্যবন্ধু তন্ময়ের বাড়িতে যায় অরুণাংশু রায়। খানিক আড্ডা, চা, ধূমপান চলে। তন্ময়দের পাশের বাড়ির মেয়ে উমা মাঝে মধ্যেই সেই আড্ডায় এসে যোগ দেয়। উমা মুখ ফুটে কখনো বলেনি, তবে অরুণাংশু অনুমান করে যে উমা ওকে পছন্দ করে। তন্ময়কে একবার একথা জানাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলেছিল, 'মেয়েটা বড় ভাল রে, তবে ওর ভাগ্যটা মন্দ।' অরুণাংশু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তন্ময়ের দিকে। তন্ময় বলতে লাগল, 'ওর মাবাবা ছোট বেলাতেই মারা গেছে। কাকা ওকে মানুষ করেছে। কাকার নিজের তিনটে ছেলেমেয়ে। এর উপর উমার দায়িত্ব। বুঝতেই পারছিস, কাকাকাকিমার বিরক্তির একটা বড় কারণ হল উমা। পর পর কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে ভেঙে গেল ওর। কোন পাত্রপক্ষই ওকে পছন্দ করছে না। বেচারির একমাত্র অপরাধ ওকে দেখতে তেমন ভাল নয়।' অরুণাংশু ভাবছিল এই একটা কারণের জন্যেই কি উমাকে ওও প্রত্যাখ্যান করছে না মনে মনে? মুখশ্রী তেমন ভাল নয়, এটুকু ছাড়া আর কোন ত্রুটি আছে ওর? বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি, মি শুকে, সাহিত্যের ব্যাপারে অপরিসীম উৎসাহ, পড়াশুনাও করে যথেষ্ট, এতগুলো গুণকে ছাপিয়েও ওর ওই শ্যামলা রঙ, কিঞ্চিৎ উঁচু দাঁত, লাবণ্যহীন মুখমন্ডলই কি বড় হয়ে ওঠেনি অরুণাংশুর কাছে? নিজেকে হঠাৎ অপরাধী মনে হয় ওর। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকা উমার মুখটার দিকে তাকাতেই কেমন একটা বেদনা অনুভব করল ওর জন্যে। যে মেয়েটা ওকে এতটা শ্রদ্ধাসম্মান করে তার প্রতি কি ওর কোনই দায়িত্ব নেই? ওকি একটা ভাল পাত্র ঠিক করে দেবে উমার জন্য? নাঃ সেটা হয়তো ঠিক হবে না। উমা তাতে অপমানিত হতে পারে। যাকে ও মনে মনে ভালবাসে সেই তার জন্য পাত্র ঠিক করে দিচ্ছে এটা একটা বড় ধাক্কা হবে ওর পক্ষে। সুতরাং এটা করা যাবে না। তাহলে কি নিজেই বিয়ে করবে উমাকে? ভাবনাটা মাথায় আসতেই মনটা কুঁকড়ে গেল ওর। উমাকে বউ হিসাবে ও ভাবতে পারে না কিছুতেই। বউ বলতেই ওর মাথায় যে ছবিটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে উমার কোন মিল নেই। 'তখন থেকে এত কি ভাবছেন অরুণদা?' উমার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল অরুণাংশু। উমা বলল, 'আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে অনুরোধ করেছিলাম। সে তো আর লিখলেন না। লিখবেনই বা কেন? কি আছে আমার লেখবার মত? সাধারণ একটা জীবন। তবে ভূতেরা তো আর আমার মত সাধারণ নয়। তাদের নিয়ে তো অনেক কিছু লেখা যায়। লিখুন না একটা ভূতের গল্প অরুণদা।' বাচ্চা মেয়ের মত বায়নার সুর উমার গলায়। অরুণাংশু হেসে ফেলে। বলে, 'ঠিক আছে লিখব। তবে যে কোন একটা বেছে নাও। হয় ভূত নিয়ে লিখব, নয়তো তোমাকে নিয়ে লিখব।' উমা ঝলমল করে উঠল। বলল, 'সত্যি লিখবেন আমাকে নিয়ে?' অরুণাংশু বলল, 'হ্যাঁ লিখব। তবে ঐ যে বললাম, হয় ভূত, নয় তুমি– যে কোন একটা।' উমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কি যেন একটু ভাবল। তারপর বলল, 'নাঃ থাক, আমাকে নিয়ে লিখতে হবে না।' অরুণাংশু অবাক হল। বলল, 'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন?' উমা বলল, 'আমাকে নিয়ে গল্প জমবে না, এমন সাদামাটা জীবন। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কী উমা?'

'না থাক, কিছু না। আপনি বরং ভূত নিয়েই লিখুন। আপনার হাতে ভূতের গল্প কেমন খোলে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

তন্ময়দের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর থেকে অরুণাংশু সারাটা ক্ষণ ভূতের গল্পের নানান প্লট ভেবে চলেছে। কোনটাই মনমত হচ্ছে না। উমা হঠাৎ ভূত নিয়ে ওর পিছনে পড়ল কেন কে জানে? যে বিষয়ের ওপর ওর মোটেই উৎসাহ নেই সে বিষয় নিয়ে লেখা যে কি মুশকিল! রাত এগারোটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে সবেমাত্র লেখার টেবিলে বসেছে ও। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই ও প্রান্ত থেকে তন্ময়ের উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'অরুণ সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'উমা সুইসাইড করেছে।'

'কী বলছিস কী! কখন?'

'খানিক আগে, গলায় দড়ি দিয়েছে।'

থরথর করে কেঁপে উঠল অরুণাংশু। তন্ময় আরো অনেক কিছুই বলছে কিন্তু ও আর কিছু শোনার অবস্থায় নেই। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ও। একটা মেয়ে আত্মহত্যা করল অথচ কয়েক ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে কথা বলে এর বিন্দুমাত্র আঁচ পাওয়া গেল না? এতটাই চাপা ছিল উমা? বিয়ের সম্বন্ধ এসে বার বার ভেঙে যাচ্ছিল ওর। এই অপমান, গ্লানিই কি বাধ্য করল ওকে এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে? নাকি অন্য কোন কারণ? মাথার ভেতর সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'উমার এই মৃত্যুর জন্য আমিও কি দায়ী নই? আমিও তো পারতাম এই অপমান থেকে ওকে রক্ষা করতে। তাহলে কি আমার উপর অভিমান করেই উমা...' বিড়বিড় করছিল অরুণাংশু।

রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিল ও কিন্তু ঘুম আসছে কই? ঘুরেফিরে উমার মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। দু'হাত দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরল ও। 'আমার জন্যই উমা শেষ পর্যন্ত...।' খট করে একটা শব্দ হল। ফিরে তাকাল অরুণাংশু। ভেজানো দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। দরজার সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে কে ওর ঘরে আসবে? বাড়ির সবাইতো ঘুমে অচেতন। ওদের করিডোরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলে সারারাত, সেই আলোর একটা আবছা আভা খোলা দরজা দিয়ে ওর ঘরে এসে পড়েছে। ওই আবছা আলোয় বেশ বোঝা যাচ্ছে দরজায় একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অরুণাংশু বলল, 'কে? কে ওখানে?' নিরুত্তর নারীমূর্তিটি এক পা দু' পা করে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। অরুণাংশু স্পষ্ট দেখতে পেল মেয়েটা উমা।

খোলাচুলে আমাকে কেমন দেখায় অরুণদা? চুল খোলা রাখলে কাকিমা আমাকে কি বকাটাই না বকত! তখন তো আর বলতে পারিনি কেন আমি চুলটা খোলা রাখতাম। আসলে আমার তো কিছুই সুন্দর নয়। সুন্দর বলতে এই একমাথা চুল। তাই সেটাই দেখাতাম সকলকে। বিশেষ করে আপনাকে। আজ অন্তত একবার বলুন না কেমন লাগছে আমাকে খোলাচুলে?'

আজ ইচ্ছে করেই জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বেলে রেখেছে ঘরে। উমাকে একটু স্পষ্ট করে দেখেতে চায় ও। খুট করে খুলে গেল দরজাটা। আবছা একটা নারী মূর্তি ধীরপায়ে প্রবেশ করল ওর ঘরে। এক পা, দু' পা করে এগিয়ে গেল খোলা জানলাটার কাছে। সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়াল। জিরো পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন অরুণদা? আমি এখন অন্ধকারের।...'

গলা শুকিয়ে গেল ওর, জিভ অসাড়। এ কি দেখছে ও! এত রাতে উমা কি করে ওর ঘরে আসবে? আজই তো মৃত্যু হয়েছে উমার। তবে কি...। নাঃ তাইবা কি করে হয়? ভূত বলে কিছু তো নেই। এ নিতান্তই চোখের ভুল। কিন্তু ওর ভুল ভাঙিয়ে কথা বলে উঠল মেয়েটি। 'চিনতে পারছেন না অরুণদা?' একটা বিষাক্ত পোকা যেন বিষ ছড়াতে ছড়াতে তলপেট থেকে উপরের দিকে উঠে আসছে ক্রমশ। জ্বালা জ্বালা, শিরশির করে উঠল বুকটা। অঘ্রাণের এই ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে ও। তাহলে কি ভয় পাচ্ছে অরুণাংশু? কথাতো দূর, একটা আওয়াজও বেরুচ্ছে না ওর মুখ থেকে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারল না। শুধু একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। উমা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, 'ভয় নেই, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। শুধু কয়েকটা কথা বলার জন্য এত রাতে এখানে ছুটে এলাম', বলেই খোঁপাটা টান মেরে খুলে দিল উমা। একঢাল কালো চুল ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখের চারপাশে। 'খোলাচুলে আমাকে কেমন দেখায় অরুণদা? চুল খোলা রাখলে কাকিমা আমাকে কি বকাটাই না বকত! তখন তো আর বলতে পারিনি কেন আমি চুলটা খোলা রাখতাম। আসলে আমার তো কিছুই সুন্দর নয়। সুন্দর বলতে এই একমাথা চুল। তাই সেটাই দেখাতাম সকলকে। বিশেষ করে আপনাকে। আজ অন্তত একবার বলুন না কেমন লাগছে আমাকে খোলাচুলে?' কথাগুলো বলে একটু থামল উমা। তারপর বলল, 'থাক, বলতে না চাইলে বলতে হবে না। আজ যাই। কাল আবার আসব ঠিক এই সময়। ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।' মন্থর গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল উমা। চৌকাঠের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। করিডোরের আবছা আলোয় দেখা গেল উমা ওর এলোচুলে হাত বোলাচ্ছে। একগাছি চুল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে বলল, 'চলি অরুণদা।' তারপর ঝপ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

খাটের উপর স্থানুর মত বসে রইল অরুণাংশু। নড়াচড়া করার শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে ওর। কতক্ষণ এভাবে বসেছিল জানা নেই। ভোরের আলো কাচের জানালা চুঁইয়ে ওর বিছানার উপর এসে গড়িয়ে পড়েছে। শরীরটাকে কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল ও। দু'পায়ে ঝিঁঝি লেগে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানলার সামনে গেল। দু'হাত দিয়ে ঠেলে পালটা খুলে দিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমু খে এসে লাগল। বেশ আরাম লাগছে ওর। কী ঘটে গেল রাতে? একি চোখের ভুল? নাকি সত্যি উমা এসেছিল? উমা কী করে আসবে? ওতো গতকাল মারা গেছে কিন্তু ও যা দেখেছে সেও তো ভুল নয়। ও কি ভূত দেখল? তাহলে কি ভূত সত্যি আছে? নাঃ এ নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ভাল। ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করল অরুণাংশু। শরীরটা একটু যেন ঝরঝরে লাগছে কিন্তু মনের ভিতর খচখচানিটা থেকেই যাচ্ছে। উমাতো বলে গেল আজ রাতে আবার আসবে। আসবে কি সত্যি? যদি আসে তাহলে আর ভয় পাবে না। আজ যে করেই হোক উমাকে কয়েকটা কথা বলবে ও। যেন আগাম সাহস সঞ্চয় করে রাখছে বুকের ভিতর। সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি ও। হরিদার চায়ের দোকানে রবিবারের জমজমাট আড্ডাতেও যায়নি আজ। ভেতরে ভেতরে যেন এক রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। তাহলে কি ও সত্যি ধরে নিয়েছে উমা আবার আসবেই। যদি তাই হয় তাহলে তো ও ইতোমধ্যেই ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। একথা মনে হতেই বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গেল অরুণাংশুর। ধুর কি যে আবোলতা বোল ভাবছে! কালকের ব্যাপারটা স্রেফ একটা দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু তাই কি? চোখের মত কানও কি ভুল করল? উমার কণ্ঠস্বর যে স্পষ্ট শুনতে পেল! এক সাংঘাতিক অস্থিরতায় ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে ওর।

এখন রাত এগারোটা। রাতে তেমন কিছুই খেল না অরুণাংশু। শুধু খাওয়া নয়, কোন কাজই মন লাগিয়ে করতে পারছে না ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঘড়ির দিকে তাকাল একবার। বেঁচে থাকতে যে মেয়ের উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি কখনো, আজ কেন সে মেয়ের জন্য পলঅনুপল গুণছে ও? উমা তো বলেছিল রাত দুটো নাগাদ আসবে। আজ এলে উমাকে ও কি কি বলবে সেটা একবার ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করল মনে মনে। জীবিত উমাকে যে কথা কোনদিন বলা হয়ে উঠেনি, মৃত উমাকে সে কথাগুলো বলে আর লাভটাই বা কি? এক অদ্ভুত দোটানায় ভুগছে অরন্নণাংশু।

কাল সকালে অফিস বেরুনোর তাড়া আছে। এখন ওর শুয়ে পড়াই উচিত। কিন্তু শুয়ে পড়লে যদি ঘুম এসে যায়? না না আজ কিছুতেই ঘুমাবে না ও। উমার সঙ্গে ওকে কথা বলতেই হবে। কিন্তু উমা আজ সত্যি আসবে তো? এসব ভাবতে ভাবতে একটু ঝিমুনির মত এসেছিল ওর। ঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বিছানার উপর মেরুদণ্ড সোজা করে বসল ও। আর ভেজানো দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। আজ ইচ্ছে করেই জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বেলে রেখেছে ঘরে। উমাকে একটু স্পষ্ট করে দেখতে চায় ও। খুট করে খুলে গেল দরজাটা। আবছা একটা নারীমূর্তি ধীরপায়ে প্রবেশ করল ওর ঘরে। এক পা, দু' পা করে এগিয়ে গেল খোলা জানলাটার কাছে। সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়াল। জিরো পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন অরুণদা? আমি এখন অন্ধকারের। আলো আমার সহ্য হয় না।' অরুণাংশু বলল, 'তোমাকে একটু ভাল করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তাই।' উমা হাসল। বলল, 'তাহলে বড় আলোটা জ্বাললেন না কেন? অরুণাংশু মৃদু গলায় বলল, 'খুব চড়া আলোয় তোমায় দেখতে চাইনি উমা। তোমার এই আলোছায়া অ স্তত্বটাই আমার কাছে বেশি কাম্য।' উমা এবার একটু শব্দ করেই হাসল। বলল, 'বাইরের আলোয় একটা মানুষকে আর কতটুকু দেখা যায় অরুণদা? ভেতরের আলোটাই আসল।' অরুণাংশু অসহায়ের মত বলে উঠল, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পার না উমা?' উমা এবার গম্ভীর হল। ভারী গলায় বলল, 'সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ তো মানুষের সহজাত। অসুন্দরের ভেতরকার সৌন্দর্যটুকু দেখতে পাওয়ার মত দুর্লভ মানুষ আর ক'জন আছে? যে ক'জন আছে তার মধ্যে যে আপনি পড়েন না সে তো আমি

অরুণাংশু থমকে গেল। উমা সৌমেন নামের কাউকে ভালবাসত? ওর ভালবাসার পাত্র অরুণাংশু নয়? তাহলে এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছে তা ভুল? উঠে দাঁড়াল অরুণাংশু। নীরবে তন্ময়ের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। উমার মৃত্যুর জন্য তাহলে ও বৃথাই নিজেকে দায়ী করছিল? একটা বড় অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেল ও কিন্তু মন যতটা হাল্কা লাগা উচিত ততটা তো লাগছে না!

আগে থেকেই জানি। তাহলে আর নতুন করে ক্ষমার কথা আসছে কেন?' অরুণাংশু মর্মাহতের মত বলল, 'না, উমা না। আমি সত্যি তোমাকে পছন্দ করতাম। না হলে তন্ময়দের বাড়িতে গেলেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম কেন? তোমাকে ভাল লাগত বলেইতো।' উমা একচোট হেসে নিল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আপনারা লেখকরা বেশ বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন কিন্তু। আসলে আপনি জানতেন আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনার প্রতি আমার ওই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে আপনি এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। সেই কারণেই আমাকে ডেকে পাঠাতেন, একি আমি বুঝি না অরুণদা? আমি সব বুঝি। তবে এরজন্য আপনাকে দোষারোপ করি না আমি।' কথাগুলো বলেই উমা ওর চুলটা হাত দিয়ে একটু পরিপাটি করে নিল। আজও খোলাচুলেই এসেছে ও। জানলার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসল চিবুকে হাত ঠেকিয়ে। বলল, 'যে কথা বলতে আজ এসেছি সেটাই এখনো বলা হল না।' 'কী কথা উমা? বল না' ক্ষীণ গলায় বলল অরুণাংশু। 'আমাকে আপনার ভাল লাগত বললেন না? যদি তাই হয়, তাহলে জীবিত নাকি মৃত উমা, কাকে বেশি পছন্দ আপনার?' এমন অদ্ভুত প্রশ্নের কী উত্তর দেবে বুঝে পেল না অরুণাংশু। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এ প্রশ্নের কী উত্তর দিই বল তো? আসলে তুমি যখন জীবিত ছিলে তার চেয়েও আমার কাছে অনেক বেশি জীবিত তুমি এখন। তখন যে কথাগুলো তোমায় বলতে পারিনি এখন সেগুলো কেমন অনায়াসে বলে ফেলতে পারছি দেখছ না? মৃত্যু মানুষকে যতটা কাছের করে তোলে জীবন তা পারে না।' উমা হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে মরে গিয়ে ভালই করেছি বলুন? আজ আমাকে ভয় পাননি দেখে খুব ভাল লাগল। যদি পেতেন তাহলে এ মৃত্যু আমার পক্ষে জীবনের থেকেও অসহনীয় হয়ে উঠত।' উমা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অরুণাংশু মরিয়ার মত বলে উঠল, 'দাঁড়াও উমা, যেও না, তোমাকে এখনো অনেক কথা বলার বাকি।' উমা শান্ত গলায় বলল, 'সব কিছু নাই বা বললেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বার বার ভেবেছি, এভাবে চলে যাব? এখনো যে অনেক কিছু জানার বাকি রয়ে গেল। কিন্তু তখনি মনে হয়েছে, জীবনে কিছু অজানা, অধরা থাকা ভাল, তাতে মৃত্যু অনেক সহজ হয়ে যায়। আর মৃত্যু সহজ হয়ে গেলে মানুষ মুক্ত, আর কোন পিছুটান থাকে না।' 'তাহলে তোমার আর কোন পিছুটান নেই বলতে চাও?' বলল অরুণাংশু। উমা বলল, 'সে তো নেইই। থাক লে কি আর এত সহজে এভাবে আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম? আজ আমার আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চাওয়াপাওয়ার কিছুই নেই।'

'তাহলে এলে কেন উমা? না এলেও তো পারতে।'

'হয়তো পারতাম। তবুও এলাম কেন জানেন? মানুষ মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যুর অচিরেই মৃত্যু ঘটুক কেউ চায় না অরুণদা। সেই কারণেই আমার এখানে আসা। চলি, ভাল থাকবেন। কাল পারলে একবার আসব এই সময়।' ঠিক গতকালের মতই হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল উমা। অরুণাংশু ভাবছিল, মৃত্যুর অচিরেই মৃত্যু ঘটুক, এটা না চাওয়ার পিছনেও কি এক ধরনের সূক্ষ্ম পিছুটান নেই? একেবারে মুক্ত হতে চাওয়ার বাসনাও তো এক প্রকার বন্ধনই।

ভোর হতে না হতেই অরুণাংশু ফোনের রিসিভার তুলল। 'হ্যালো তন্ময়, আমি অরুণাংশু বলছি। তোর ওখানে আসছি এখনি। অসুবিধা নেই তো?' 'তুই আসবি এতে অসুবিধার কী আছে? তবে এত ভোরে! কিছু হয়েছে নাকি?' উদ্বিগ্ন গলায় বলল তন্ময়। অরুণাংশু কিছু না বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল। পাজামার ওপর হাফ শার্টটা গলিয়ে নিল। চোখেমুখে জলটুকুও না দিয়ে ওভাবেই সাইকেল নিয়ে সোজা হাজির হল তন্ময়ের বাড়ি। এত ভোরে ওকে এভাবে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেল তন্ময়। বলল, 'কী ব্যাপার অরুণ, কী হয়েছে? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?' অরুণাংশু বলল, 'ভেতরে চল, কথা আছে।' গত দু'রাত ধরে যা যা ঘটেছে সবিস্তারে বলল তন্ময়কে। সবটা শুনে তন্ময় বলল, 'ওসব কিছু না, সব তোর হ্যালুসিনেশান। উমার আত্মহত্যার কারণটা কাল শুনলাম, ওর কাকিমার কাছে। ও নাকি সৌমেন নামের একটা ছেলেকে ভালবাসত। ছেলেটি ওকে বিট্রে করেছে। সেই কারণেই উমা...।' অরুণাংশু থমকে গেল। উমা সৌমেন নামের কাউকে ভালবাসত? ওর ভালবাসার পাত্র অরুণাংশু নয়? তাহলে এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছে তা ভুল? উঠে দাঁড়াল অরুণাংশু। নীরবে তন্ময়ের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। উমার মৃত্যুর জন্য তাহলে ও বৃথাই নিজেকে দায়ী করছিল? একটা বড় অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেল ও কিন্তু মন যতটা হাল্কা লাগা উচিত ততটা তো লাগছে না! কী ছিল ওই সৌমেন নামের লোকটার যা ওর ছিল না? মনের ভেতর কোথাও যেন একটা দুঃখবোধ রয়েই গেল ওর। আজ রাতে উমা এলে একবার জিজ্ঞাসা করবে, কী দেখে সৌমেন নামের ওই লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ও? এ প্রশ্নের উত্তর ওকে পেতেই হবে।

সারাটাদিন মনমরা হয়ে অফিসের কাজকর্ম করল অরুণাংশু। বাড়ি ফিরে কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি ও। সারাটাদিন আকুল হয়ে অপেক্ষা করেছে কখন রাত দুটো বাজবে, কখন উমা আসবে। অবশেষে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। উদগ্রীব হয়ে ও বসে আছে উমার জন্য। ঘড়ির কাঁটা রাত দুটোর ঘর ছাড়িয়ে প্রায় তিনটের কাছাকাছি আসতে চলল। কই উমাতো এল না! রাত প্রায় ভোর হতে চলল। তাহলে কি উমা আজ আসবে না?

গত সাতদিন ধরে অরন্নণাংশু রোজ রাতে অপেড়্গা করছে উমার জন্য কিন্তু উমা আর আসেনি। পরপর দু'রাত উমাকে যে ও দেখল সেটা তাহলে কি? উমার ভূত, নাকি অন্য কোন কিছু? ভূতের গল্প লেখার জন্য উমা ওকে বার বার অনুরোধ করেছিল, কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি। আজ হঠাৎ অরুণাংশুর মনে হল, এবার একটা ভূতের গল্প নিশ্চয়ই লিখে ফেলা যায় এবং সেটা আসলে উমারই গ ল্প।

গত সাতদিন ধরে অরুণাংশু রোজ রাতে অপেক্ষা করছে উমার জন্য। কিন্তু উমা আর আসেনি। পরপর দু'রাত উমাকে যে ও দেখল সেটা তাহলে কি? উমার ভূত, নাকি অন্য কোন কিছু? ভূতের গল্প লেখার জন্য উমা ওকে বার বার অনুরোধ করেছিল, কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি। আজ হঠাৎ অরুণাংশুর মনে হল, এবার একটা ভূতের গল্প নিশ্চয়ই লিখে ফেলা যায় এবং সেটা আসলে উমার-ই গল্প।

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতের ছোটগল্পকার

ভ্রমণ

শান্তিনিকেতন

শান্তির আশ্রয়নিকেতন

ড. আবদুল মতিন

শান্তিনিকেতনে যাবার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের কিন্তু সে স্বপ্ন ফলবতী হল অতি সম্প্রতি আমার স্ত্রীকন ্যার সঙ্গে কলকাতা যাত্রার ফলে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা ব্রিগেড ময়দানে জনসভায় ট্রাফিক জ্যামের ভয়ে ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ সকালে আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারাশহর তোরণ্লব ্যানাল্ল ফেস্টুনে মোড়া।

ব্রিগেডের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, অনেক লোক তখনই সমবেত হয়ে দলের পতাকা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছল্লিসংবলিত প্লাকার্ড হাতে শ্লোগান দিচ্ছে। এই জনসভা সরাসরি সম্প্রচারের জন্য কলকাতার বিভিন্ন পয়েন্টে দু'শো বিশালাকার স্ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে। ব্রিগেড ময়দানের চারপাশে একই আয়তনের আরো ১৯টি স্ক্রিন। পথে যেতে দেখলাম ব্রিগেডমুখী শত্লশত বাস্লট্রাক।

কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের জেলাশহর বীরভূমের দূরত্ব ১৭০ কিলোমিটার– গাড়িতে প্রায় ৩ ঘণ্টার ভ্রমণ। গঙ্গার ওপর পুরনো রবীন্দ্রসেতু (হাওড়া ব্রিজ্ল)র সমা ন্তরাল নবনির্মিত বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে আমাদের গাড়ি উত্তরমুখে ছুটে চলেছে কলকাত্মদিলি্ল মহাসড়ক ধরে। দুই সেতুরই নাম দুই মনীষীর নামে– কোন রাজনীতিবিদের নামে নয়। কলকাত্মদিলি্ল মহাসড়কের পূর্বতন নাম ছিল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। মুঘল সম্রাট হুমায়ূনকে সিংহাসনচ্যুত করে পশতুযোদ্ধা শের শাহ সুরী যখন দিল্লির শাসক, তখন এই সড়কটি

নির্মিত হয়। এই মহাসড়কের বিস্মৃতি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত।

চারলেনের রাস্তা ধরে আমাদের সেই সড়কভ্রমণ ছিল স্বস্তিদায়ক। জ্যোতি বসুর কমিউনিস্ট পার্টির শাসনামলে কলকাতার বাইরে গ্রামবাংলার চিত্রপট নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে– উষর মাঠের পরিবর্তে এখন সেখানে ফসলের হাতছানি। মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ বাড়িঘরই পাকা, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ– খড়ের কিংবা টিনের চালাঘর প্রায় দেখাই যায় না। অনেক বাড়ি রীতিমত প্রাসাদোপম। আমরা হুগলি এবং বর্ধমান শহরের পাশ কাটিয়ে বর্ধমান জেলা পেরিয়ে এলাম। শান্তিনিকেতনে পৌঁছনোর রাস্তার মাঝামাঝি টেলিফোন করলাম আমার বন্ধু অধ্যাপক ডিপি সেনগুপ্ত (পাহাড়িদা)কে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আমরা লিভারপুল ইউনিভার্সিটিতে একই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে লেখাপড়া করতাম। তিনি স্বনামধন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)এর ই লেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। পাহাড়িদা জানলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর বড়বোন ঊষা মুখোপাধ্যায় আছেন। তাঁর ফোন নম্বর দিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে তাঁকে ফোন করতে বললেন। পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। পাহাড়িদার ফোন শেষ হতে না হতেই ঊষাদি আমাকে ফোন করে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন।

পানাগড়ের কাছে মহাসড়ক ছেড়ে ডানে মোড় নিয়ে আমাদের গাড়ি একটি দুই লেনের রাস্তা ধরল। বেশ ব্যস্ত রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি অপরিচ্ছন্ন দেহাতি রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম চ্যাপা নের জন্যে। তখন প্রায় দুপুর। এক পর্যায়ে মরা নদীর ওপর ছোট্ট সেতু নির্মাণের জন্য আমাদের পাকা সড়ক ছেড়ে গ্রামের মেঠো পথে নামতে হল। চ্যাপা নের বিরতি এবং এবড়োখেবড়ো রাস্তায় চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় আমাদের শান্তিনিকেতন পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হল। দেড়টা নাগাদ আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম।

উঠলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট লজে। চমৎকার জায়গা। খুব আধুনিক নয় কিন্তু মৌলিক সব চাহিদা পুরনের বন্দোবস্ত রয়েছে। শান্ত পরিবেশে অনেকগুলো একতলা বাড়ি– প্রতিটিতে একট্রিদু 'টি কামরা, সামনে মৌসুমি ফুলে পরিপূর্ণ আয়তকার বাগান। আমরা কটেজের একটি বড় কামরা নিলাম। তারপর দ্রুত পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে মধ্যাহ্নভোজের জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

বিকেল ৪টা নাগাদ আমরা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। শান্তিনিকেতনের প্রকৃত নাম ভুবনডাঙা। ব্রিটিশ লর্ডসভার প্রথম ভারতীয় সদস্য লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহার পারিবারিক সম্পদ ছিল ভূবনডাঙা। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিনহা পরিবারের কাছ থেকে জায়গাটি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ দেখে মহার্ষি জায়গাটির নাম রাখেন শান্তিনিকেতন।

প্রকৃতির কোলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা দানের দর্শন মাথায় রেখে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচজন শিক্ষার্থী নিয়ে এখানে একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, নাম দেন পাঠভবন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে কলা, ভাষা, মানবিক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের কার্যক্রম হাতে নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯২২ সালে এর নামকরণ করা হয় বিশ্বভারতী। ১৯৫১ সালে এটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ভারত সরকারের স্বীকৃতি পায়। ইন্দিরা গান্ধী, সত্যজিৎ রায়, নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেনসহ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন ক্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয়শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। নতুনপুর নো ভবনগুচ্ছ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সে আছে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠান, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, উপাসনাগৃহ, ছাত্র আবাসন এবং প্রশাসনিক ভবন আর আছে পাঠদান, খেলাধূলার জন্য খোলা মাঠ, ফুলের বাগান ও প্রমোদোদ্যান।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের অন্যতম প্রাচীন ও সবচেয়ে অলংকৃত নির্মিতি হচ্ছে উপাসনাগৃহ। ১৮৬৩ সালে কবির পিতা এটি নির্মাণ করেছিলেন। চারদিকে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি সংবলিত রঙিন কাচের বাড়ি হচ্ছে এই প্রার্থনাগৃহ। প্রতি বুধবার বিশেষ প্রার্থনার সময় এটির দরজা খোলা হয়। অনেকে একে মন্দিরও বলে থাকেন। আমাদের ভ্রমণের সময় এটি বন্ধ ছিল। তাই বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়! দেবেন্দ্রনাথ এখানে ছাতিমতলায় বসেও প্রার্থনা করতেন।

কলা আর সঙ্গীতভবন হচ্ছে বিশ্বভারতীর দুই বিখ্যাত ভবন। কলাভবনে মানবিক শাখা আর সঙ্গীতভবনে সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগের কার্যক্রম চলে। একইভাবে হিন্দিভবনে হিন্দি শিক্ষা, চিনাভবনে চিন ও এশিয়াবিষয়ক শিক্ষা, বিদ্যাভবনে মানবিক বিষয় আর শিক্ষাভবনে বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠদান চলে। বিনোবা ভবনে শিক্ষা, রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক পড়াশোনা চলে। পাশাপাশি কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে যেমন ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর ন্যাশনাল ইন্টেগ্রেশন, রুরাল এক্সটেনশন সেন্টার, সেন্টার ফর রুরাল ক্রাফট্, টেকনোলজি এন্ড ডিজাইন, সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি, সেন্টার ফর ম্যাথমেটিকস এডুকেশন, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এবং কম্পিউটার সেন্টার।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হচ্ছে কালোভবন– আলকাতরায় মোড়া কাদামাটির একটি বাড়ি। এটি শেষবর্ষের শিক্ষার্থীদের আবাসন। কল্পিপরিবা রের জন্য ১৯০২ সালে নির্মিত হয় নতুন বাড়ি–

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসনি্ধানে মহাত্মা ও কস্তুরবা গান্ধী

চালাঘরের বাড়িটি এখন সভাকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের ভ্রমণের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এঁরা এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের একটি পাক্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রয়েছে ৩ লাখ ৭৬ হাজারের অধিক বইয়ের সমৃদ্ধ সংগ্রহ।

সেদিন উত্তরায়ণ কমপ্লেক্স বন্ধ ছিল। পরের দিন দেখব বলে ফিরে এলাম। উত্তরায়ণের চারদিকের খোলামেলা ভাব আর প্রকৃতির সঙ্গে নৈকট্য আমাদের মুগ্ধ করল। আমরা আম্রকুঞ্জ ঘুরে দেখলাম– এখানে গাছের তলায় ক্লাশ বসে। ইটের সারি দিয়ে ক্লাশের চৌহদ্দি টানা। শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষক যেখানে বসেন, সেখানে একটা সাধারণ ইটের মঞ্চ। ভবনের অনেক বারান্দায় আমরা শিক্ষার্থীদের আপনমনে পাঠ নিতে ও পড়ালেখা করতে দেখলাম।

সুন্দর বাগান ও গাছগাছালিশোভিত গোটা চত্বরটা যেন এক নয়নাভিরাম প্রমোদোদ্যান। চত্বরের ভেতরে বড় একটা খেলার মাঠ। বোঝা যায় পড়ালেখার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলার প্রতিও সমান গুরুত্ব এখানে। চত্বরের ভেতরে যন্ত্রচালিত গাড়ি বা রিক্সা চলাচলের অনুমতি নেই। দ্বিচক্রযানই একমাত্র বাহন। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের দল সাইকেলে চেপে হুটোপুটি আড্ডায় মশগুল– দেখতে বেশ লাগে। বিভিন্ন ভবন, ভাস্কর্য, বাগান দেখতে দেখতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। একসময় ঘোরাফেরার সময় শেষ হয়ে এল। আমরা ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে।

সন্ধ্যায় আমরা ঊষাদির বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। মোহরদি অর্থাৎ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটভাই পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঊষাদির বিয়ে হয়েছিল। মোহরদির বাড়িতেই উনি থাকেন। ঊষাদির বাবা অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯৪৭এ দেশভাগের সময় বরিশাল বি এম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তারপর তারা কলকাতা চলে আসেন। ঊষাদির দুই ভাই অধ্যাপক সন্তোষ সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক সুনীল সেনগুপ্ত বিশ্বভারতীতে দর্শন ও কৃষ্নিঅর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। সুনীলদা এক দশক আগে ঢাকা বেড়াতে গেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

ঊষাদি আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বয়স প্রায় ৮৫র কাছাকাছি, পুরোবাড়িতে তিনি একাই থাকেন। এই বয়সেও ঊষাদি যথেষ্ট সুন্দরী ও আভিজাত্যপূর্ণ। তিনি আমার স্ত্রীকন্যা এবং আমাকে যথেষ্ট সমাদর করলেন। এসময় পাহাড়িদা ফোন করতে তাঁকে বললাম, 'ঊষাদি নিশ্চয়ই আমার বোন, আপনার নয়। আপনি মনে হয় আমার ছোটবেলায় তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।' আমার কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আমরা ঊষাদির সঙ্গে কয়েকটি ছবি ওঠালাম। বেরিয়ে আসার সময় ঊষাদি বার বার করে বললেন, আমরা যেন আবার তাঁকে দেখতে আসি এবং হোটেলে না উঠে তাঁর বাড়িতে থাকি। আমাদের ভারতে থাকা অবস্থায় তিনি অনেকবার ফোন করেছিলেন, সুখসুবিধার খোঁজ নিয়েছিলেন।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গান শিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর প্রকৃত নাম অনিমা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামে তাঁর নতুন নামকরণ করেন। তিনি সঙ্গীতভবনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে অধ্যক্ষ অবধি হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীতে কণিকার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার জমিদার বাড়িতে তাঁর জন্ম। আমিও নেত্রকোনার সন্তান। শৈলজারঞ্জন মোহনগঞ্জে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অনেকবার তাঁর জন্মভূমিতে বেড়াতে এসেছেন, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও। ১৯৮৭ সালে তিনি শেষবারের মত নেত্রকোনা আসেন, তখন তাঁর বয়স ৮৭। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সেবার মোহনগঞ্জ পর্যন্ত যেতে পারেননি। আমি ছোটবেলায় দুর্গাদাস মজুমদার নামে তাঁর এক খুড়তুতো ভাইকে কয়েকবার আমাদের পুরনো বাড়িতে দেখেছি।

পরের দিন সকালে শ্রীনিকেতনে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য ১৯২২ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে গ্রাম্য কারুপণ্য কেন্দ্র, গ্রামের শিশু ও বয়স্ক মানুষদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং রুরাল এক্সটেনশন সেন্টার রয়েছে। শেষোক্ত কেন্দ্রে কৃষি কারিগরি ও গোপালন গবেষণা পরিচালিত হয়। শিক্ষা, স্বয়ম্ভরতা, কৃষি উদ্ভাবন ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে কবি যে স্বপ্ন দেখতেন, এসব প্রতিষ্ঠান তার প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা থেকে আজকের দিনের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)সমূহ অনুপ্রাণিত হয়েছে নিশ্চয়ই। আমরা জানি, সাহিত্যের এমন কোন মাধ্যম নেই যেখানে তাঁর পদচারণা নেই– কী কবিতা, কী ছোটগল্প, কী উপন্যাস, কী নাটক, কী প্রবন্ধ, কী ভ্রমণকাহিনি, কী গীতিনাট্যনৃত্যনাট্য, কী গান– সবখানেই তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি একাধারে গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষক, দার্শনিক, সমাজ্ঞ সংস্কারক, কৃষিবিদ, পরিবেশবিদ, রাজনীতিবিদ– কী নন?

আমরা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের স্বয়ম্ভরতার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের ভাবনা থেকে প্রতিষ্ঠিত গ্রামোন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান অমর কুটির ঘুরে দেখলাম। সেখান থেকে কিছু কাঁথা স্টিচ শাড়ি ও হস্তশিল্প কিনলাম। শ্রীনিকেতন বেড়াতে এলে শিল্পগ্রাম অবশ্যদ্রষ্টব্য প্রমোদোদ্যান। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ যেমন বিহার, অসম, ওড়িশা, মণিপুর, আন্দামান

ও ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের সম্মিলন এই শিল্পগ্রাম। বাড়ির দেয়ালগুলো চিত্রকর্মে সজ্জিত। বাড়িগুলোর ভেতরে নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। গোটা চত্বরজুড়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত উপজাতীয় নারী পুরুষের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য। চত্বরের ভেতরে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রির ব্যবস্থা আছে।

সেদিন বিকেলে আমরা উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে গেলাম। এটা সম্ভবত বিশ্বভারতীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। পাঁচটি ভবন নিয়ে এই সুপরিসর কমপ্লেক্সে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। ভবনগুলি হচ্ছে উত্তরায়ণ, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচী। রবীন্দ্রভবনসহ এসব ভবন এখন জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চমৎকার বাগান ও প্রমোদোদ্যান পরিবেষ্টিত এই ভবনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত আসবাব, হস্তশিল্প ও টুকিটাকি স্মারকচিহ্ন শোভা পাচ্ছে। ১৯১৩ সালে প্রাপ্ত নোবেল পুরস্কারের মূল পদক, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রদর্শনবস্তু ২০০৪ সালে এই জাদুঘর থেকে চুরি হয়ে যায়। এসব জিনিস আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখন জাদুঘরে নোবেল পদক ও সনদের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হচ্ছে। উত্তরায়ণের চারপাশের বাগান ও প্রমোদোদ্যানের গাছপালা কবিপুত্র উদ্যানবিদ রথীন্দ্রনাথ নিজের পরিকল্পনামত সৃজন ও রোপণ করেছিলেন। বসন্তোৎসব ও পৌষমেলা উপলক্ষে শান্তিনিকেতন উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের অনেক অধ্যায় শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতন হচ্ছে তাঁর জীবন, চিন্তাধারা ও দর্শনের বাতিঘর এবং মানবিক মূল্যবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধীকে লেখা শেষ চিঠিতে কবি বলেছিলেন, 'বিশ্বভারতী হচ্ছে আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বহনকারী তরীর মত। আশা করি এটির সংরক্ষণে আমার দেশবাসীর বিশেষ প্রযত্ন পাওয়া যাবে।'

কবির সে আশা পূরণ হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক এটি দেখতে আসেন। কবির ভক্তদের কাছে শান্তিনিকেতন এখন তীর্থভ্রমণের মত। এই ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়শহ রের সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভূত হয়। এমনকি পার্শ্ববর্তী বাজারের দোকানপাট পর্যন্ত তাঁর কবিতা,নৃত্যনাট্য কাব্যগ্রন্থ বা বইয়ের নাম থেকে নেওয়া। বোলপুরে গাছের তলায় একটা চায়ের দোকানও কবির নামাঙ্কিত।

পরদিন সকালে আমরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই ক্ষণিক ভ্রমণেও আমার ঈপ্সিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমি যার পর নাই পরিতৃপ্ত। শান্তিনিকেতনের অসাধারণত্ব, এর সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, বিশেষ করে উষাদির আপত্যস্নেহ আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ড. আবদুল মতিন শিক্ষাবিদ

কাছে, দূরের মানুষ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা)
সাজানো অক্ষরমালার গায়ে ঘাম
মানব্লমানবীর ঘব্লসংসার
ঈশ্বব্লঈশ্বরীর ঘব্লসংসার
সেই সময়ের মানুষের স্বপ্নে
সাদাভাত আনন্দ শিশুর মুখ;

শুনেছি আপনি প্রতিরাতে
স্বপ্ন দেখতেন; সংসারের পাশেই
সুপ্রবীণ চন্দনবনে দাঁড়িয়ে; অরণ্যের দিনরাত্রি
পল্লবেরা সুসময়ে ফুল হয়ে ফোটে
অমৃতের পুত্রকন্যাদের বুকে আগুন
দিন বদল্লেবদ লে যায়
সুদীর্ঘ ছায়ারা হেঁটে হেঁটে যায়;

বুক্সফাটা য ন্ত্রণার পঙ্‌ক্তিমালা
দায়বদ্ধতায় সন্ধেপ্রদীপ হাতে
কত কথা রেখেছে শতাব্দীশতা ব্দীর মানুষ
কেউ ভোলেনি সামাজিক চুক্তি মতবাদ
কথা রেখেছে মানুষ কেউ ভোলেনি কোন কথা
বৃষ্টিধোওয়া আকাশের নীল হাসছে
গন্ধলেবুর বনে সেই হাস্যময় নীল;

পরাক্রান্ত সময় নতজানু মানুষের কাছে
এক্সএকটা দুঃ খের এক্সএকটা ম ৃত্যুর বুকে
হাত রাখে দীর্ঘায়ু সময়
সেই সময়ে কবিতা হয়
নীল লোহিত রঙের গল্প হয়।

প্রণব চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

উড়ান্নকথন ॥ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আকাশের কাছে এলে ভারসাম্য টের পাওয়া যায়
উড়ন্ত পাখির দল, একট্টিদু 'টি সামান্য বিমান
নদীটির তটরেখা রূপালি চুলের মত পৃথিবীর সবুজ মাথায়
নির্বাসিত, অবিমৃষ্যকারীদের উত্থানের এই অভিযান
লিখি কক্ষে, ঠাণ্ডা ঘরে, অনুকূল জানলা শোভিত।
তবু মেঘ ভিড় করে, খাতার পাতায় ওরা অনিশ্চিত বৃষ্টি নিয়ে আসে
উৎফুল্ল ডানার চেয়ে উড়ানের কষ্টগুলি লিখি যত্নে, যেভাবে স্লেকবি
রৌদ্রের আশ্বিন্নগ ন্ধ খুঁজেছিল ঘাস থেকে ঘাসে...

তবুও আকাশ চায় আকাশের কাছে যাক য্যকিছু মলিন
শায়িত অক্ষরগুলি লেখার বিরুদ্ধে যদি যায় কোনওদিন
তবুও কি মিথ্যা হবে, অভিসন্ধি, গূঢ় এই অভিযাত্রীদের?
আকাশের কাছে গেলে অভিপ্রায় ভারসাম্যহীন।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

আঁধার না হলে কীভাবে মানুষ

রবিউল হুসাইন

সারাটা দিন যে কেটে গেল
এখনো যে সন্ধ্যে হল না
সূয্যি এখনো যে পাটে বসল না
এত এত যে আলোর বন্যা
কখন যে স্লেসব আ লোশূন্য হবে
তা তো কেউ যে বলতে পারে না
উজ্জ্বলতায় সবকিছু যে এত
উচ্ছ্বল স্পষ্ট আর পরিষ্কার
স্লেস বে তো কেউ যে কোন মালিন্য দেখে না
ছায়্মছায়া আবছায়া কিংবা
আল্মোআঁধারির অ স্পষ্টতা
দূরগামী ঝাপসা দেখ্মাঅ দেখা
কুয়াশার কোন হদিসই দেখে যে দেখা যায় না
কেন যে এত আলো কেন যে এত অম্লানতা
কেন যে এত দেখাদেখি কেন যে এত
চোখের ভেতরে চোখের পলক না পড়া
আড়াল্লআবডাল রহস ্য
লুকোচুরি দেখ্মান্ম দেখা
বল্মান্মবলা ি স্থর আলেয়াহীন
স্থবির সময়কালের থেমে থাকা
আলোকিত স্বচ্ছতার পূর্ণতায় কেন যে
কোথাও কোন অন্ধমগ ুতা নেই তা অজানা

আলোর ভেতর যদি আঁধারের আলো কিংবা
আঁধারের ভেতর আলোর আঁধার
তাদের মধ্যে যদি পরম্পরার কাঙ্ক্ষিত
স্বাভাবিক ধারাবাহিকতাই
না থাকে যদি সাঁঝের প্রদীপ
কেউ অন্ধকারে জ্বালাতেই না পারে
তা হলে কী করে সকাল হবে
কীভাবে বিকেল গড়িয়ে গড়িয়ে
সাঁঝবেলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্বপ্নের রাতে পৌঁছুবে
আঁধার না হলে কীভাবে মানুষ স্বপ্নের দেখা পাবে, কেন না

আলোর ভেতর স্বপ্নদের যে জন্ম হয় না
আঁধার না হলে যে স্বপ্নরা কোন স্বপ্ন দেখতে পারে না

প্রান্তিক স্টেশনের আগে

অপূর্ব কর

'পিক আওয়ারে' চাইনি তোমাকে
আজ যখন রক্তের ঘুমঘুম
তুমি এলে বন্নপাহাড়িয়া নদীতী রের
উছল ফুলের মৃগনাভি গন্ধ।

এখন আমি সব নীল চিঠির গান
ফিরিয়ে দেই রাতের তারার ডাকবাক্সে;
তারারাই চিরসবুজ; ওরা আরো উঁচু নীলকাশ শুষে
পান করে ঘন চাঁদের অমৃতময় হাজার হাজার লিটার দুধ।

সেখানেই যেও হে দামাল মাতাল গন্ধ,
ছায়াপথের মাদুরে শুয়ে সারারাত প্রিয় গান শোনাবে
আমি অন্ধকার নিভিয়ে শেষ ভোরে জাগাব গাঙুরের জল

আমার রক্তনৌকা যদি মধুকর আবার ছুটে যেতে চায়
দারুচিনিমাখা মেমশরীরে
বাধা দেব না। দেবই না।

অপূর্ব কর ভারতের কবি

ও বৈশাখ

আইউব সৈয়দ

এবছ রের বৈশাখ জেগে উঠল ঐ
আত্মশুদ্ধির নিয়মে;
সুগভীর সবিস্ময়ে আত্মউন্মীলন হয়ে আবৃত্তি শোনাল
উৎসবের আনন্দে শ্রুতির যোজনা
শুভময় করে নিল–
আগামী স্বপ্নলোকের অনুষঙ্গসহ যাবতীয় পরিচয়ে!
সমৃদ্ধির জানালাটি পরিচর্যা করে
রঙিন আল্পনা এঁকে মেতে উঠল প্রাঙ্গণে।
স্মরণকালের খেয়ালখুশির কাছে, কর্তব্যে সজাগ থেকেও
কালের অভয়ে শুঁকে নেয় গন্ধটুকু;
আর প্রিয় ঘর বেঁধে আত্মার বিষয়ে নেকাব সরাল রাতে

এবছ রের বৈশাখ চৌকাঠ পেরিয়ে
সাহসী শিস তুলেছে;
ফলনের পঞ্চমুগে সাড়া দিয়েছে যে সঘন স্বপ্নের ডাকে।
অপ্রস্তুত ইঙ্গিতেও তাথৈ তাথৈ নেচে
কাঁপাল সমস্ত ছায়া!
আবার নয়ন মেলে তৃষাতুর তথ্যে ছুঁয়েছে ঐ উচ্চারণ;
সন্ধিকাল ছিড়েখুঁড়ে মুখর জীবন, নবান্নের আলিঙ্গনে
জড়িয়েছে যে পুলকে।

ও বৈশাখ কেন স্বপ্নের শাসনে থাক?

সুচিত্রা– সুচিত্রা

দুলাল সরকার

শিশির না ছুঁয়ে ছুঁয়েছি তোমাকে
পদ্মপাতায় গাল রাখিনি
জলের বাগানে ভাসা শাপলা পানায়
মন রাখিনি– রেখেছি তোমার ত্বকে এতদিন;

নীল অম্বরে ফোটা পূর্ণ চাঁদের
মৌন অধরে ঠোঁট রাখিনি
অতল গোপন আবেগে কখনো ফুটিনি
যতটা ফুটেছি তোমার গোধূলি নত–
তাম্রফলক খুলেছি;

কখনো এতটা কাঁদিনি– বুকের বকুল হয়ে
এতটা ঝরিনি– যতটা ঝরেছি তোমার বিদায়ে
আউশের জলে বৃষ্টির ধারা পড়েছি।

মুগ্ধ এতটা হইনি– যতটা হয়েছি
জলের ছায়ায় দেখে মেঘের প্রতিমা গড়েছি
প্রজাপতিপাখা হলুদ ব্যথায় দীপ জ্বেলেছি
ধূপ রাত্রির কথা শুনিনি
শুনেছি তোমার যুগ্মডানার আগুনের জলে ভিজেছি।

বোঝান্না বোঝায়

অরুণ দাশগুপ্ত

তোমার নৈঃশব্দ টেনে আনে
টেনে আনে আমাকে চৌধুরীদের
হাজামজা পদ্মদীঘির ধারে

এখানে জল আছে ন্যাথাকার মত
পদ্ম নেই, শাপলা নেই, নেই কচুরিপানার ফুল
আছে শুধু হোগলার ঝোপ তার মাঝে
উলুখাগড়ার ঝাড়। আহা পদ্মদীঘি!
মাঝে মাঝে আসে দু'একটা চড়ুই
বসে হোগলায় দোল দিয়ে যায়।

কখনও ফিঙেও আসে পথ ভুলে বুঝি
দোল খায়, দোল দেয়, পুচ্ছ নাচায়
তারপর কখন যে পালায়
টের পাওয়া ভার

এই কি জীবন
দোল দেওয়া দোল খাওয়া
নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়া বোঝান্না বোঝায়!

অনুবাদ গল্প

রাজমাতা

বেদ রাহী

অনেক বছর পর সে নিজের আটপৌরে হাবেলির আধোঅন্ধকার সিঁড়ি চড়ল। ছাদে উঠে দেখে এক ধোঁয়াশা জ্যোৎস্নার চাদর গায়ে জড়িয়ে ছাদ, চিলেকোঠা, সিঁড়িঘর ও পাথরের ছাতাগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে চুপচাপ। এরকম জ্যোৎস্না কি প্রতি পূর্ণিমায় এই বিশাল ছাদটাকে এমনি সুখের কুহকে আচ্ছন্ন করে রাখে? আজ সে নিশ্চিন্তে এই জ্যোৎস্নায় মিশে যেতে চায়।

ওর সাদা দোপাট্টা একপাশে এলিয়ে আর রূপোলি চুল এলোমেলো। কামিজের বোতামও খোলা। আজ সে সারাদিন কেঁদেছে। দেওয়ালে কপাল ঠুকেছে জোরে জোরে। বিলাপ করে বুক চাপড়ে কেঁদেছে। অনেক অনেক বছরের উপেক্ষা ও মৌনতা ওকে পাথর করে দিয়েছিল। আজ সে পাথর গলেছে। এখন সে চরাচরের গায়ে জড়ানো জ্যোৎস্না আর মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের মত হালকা অনুভব করছে। ওর যেন আর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই; সব শেষ হয়ে গেছে।

সামনের রাজমহলটা যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে থাকা এক ঘুমন্ত রাজপুরী। উঁচু গম্বুজটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। চারপাশের প্রাচীর কোথাও কোথাও আলস্যে শুয়ে পড়েছে। ভাবলে মনে হয় এই তো সেদিন, অথচ কতযুগ আগে সে প্রথমবারের মত এই রাজমহলটা দেখেছিল; আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে।

বড় রানীসাহিবার সঙ্গেই প্রথমবার সে এই রাজমহলে এসেছিল। রানীর পাল্কির পেছনেই ছিল ওর পাল্কি। মহারাজা ব্রিজদেব সিংহ বিয়ে করেছিলেন শ্যামনগরের রাজকুমারীকে।

রাজকুমারীর বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। ওঁর সঙ্গে অবশ্যই এগারোজন সুন্দরী দাসী পাঠাতে হবে। আর ধন্যির থেকে রূপসী ওদের পুরো অঞ্চলে কেউ ছিল না। জাগীরদারের কাছে রাজাকে খুশি করার এর থেকে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে! সে রাজার দোহাই দিয়ে ধন্যির মাকে চরম লাঞ্ছনার মাধ্যমে একদিন বাধ্য করে। বিয়ের দিন ওর মা কাঁদতে কাঁদতে নিজের হাতে মেয়েকে সাজায়। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মেয়েকে রাজবাড়িতে পাঠায়।

যৌতুক হিসেবে সঙ্গে যে ক'জন দাসীকে আনা হয়েছিল ধন্যি তাদেরই একজন। সে সারাপথ একাকী পাল্কিতে বসে কাঁদছিল। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছিল অথচ সে নিজেই মুখে হাতচাপা দিয়ে শব্দ আটকাচ্ছিল। কেউ শব্দ শুনলে কী বলবে? কী ভাববে? এত সৌভাগ্যের কথা যে ও রানীর দাসী হতে যাচ্ছে! তাহলে ও কাঁদছে কেন? মায়ের মুখটা বারবার মনে পড়ছে। মাকে ছেড়ে আসার দুঃখ কি ভোলা যায়? এই পৃথিবীতে মা ছাড়া যে ওর আর কেউ নেই। মায়েরও ও ছাড়া আর কেউ নেই। সেজন্যেই ওকে এত দূরে পাঠাতে মায়ের আপত্তি ছিল, এত দূরে যে সারাজীবনে একটিবার চোখের দেখাও দেখতে পাবে কি না সন্দেহ। সেজন্যে ওকে একটা নির্জন জায়গায় লুকিয়ে রেখে নিজে জাগীরদারের জুলুম সইছিল। জাগীরদারের লোকেরা ওর গা থেকে জামাকাপড় খুলিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে মেরে মেরে সারা শরীরে কালশিটে ফেলে দিয়েছিল। তারপর দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিনের পর দিন খাটের নিচে ফেলে রেখেছিল। খিদে তৃষ্ণায় আধমরা হয়েও মেয়ের হদিশ দেয়নি ওর মা।

তখন রাজকুমারীর বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। ওঁর সঙ্গে অবশ্যই এগারোজন সুন্দরী দাসী পাঠাতে হবে। আর ধন্যির থেকে রূপসী ওদের পুরো অঞ্চলে কেউ ছিল না। জাগীরদারের কাছে রাজাকে খুশি করার এর থেকে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে! সে রাজার দোহাই দিয়ে ধন্যির মাকে চরম লাঞ্ছনার মাধ্যমে একদিন বাধ্য করে। বিয়ের দিন ওর মা কাঁদতে কাঁদতে নিজের হাতে মেয়েকে সাজায়। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মেয়েকে রাজবাড়িতে পাঠায়। মায়ের সেই কান্না ধন্যির সারাজীবনের বিস্মৃতি হয়ে থাকে।

মহারাজ ব্রিজদেব সিংহ নববধূকে নিয়ে রাজধানীতে পৌঁছতেই প্রজারা মহাসমারোহে স্বাগত জানাল। 'জয়, মহারাজের জয়!' ওদের মিলিত জয়ধ্বনি শুনে প্রথমে ধন্যি ঘাবড়েই গিয়েছিল। ওর বুক ধড়ফড় করছিল। পাল্কির বাইরে উঁকি দিয়ে দেখার অনুমতি নেই, তবে পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল পথের দু'পাশে বর্ণাঢ্য জনসমাগম। ঐ পর্দার ফাঁক দিয়েই সে প্রথমবার এই রাজমহলটাকে দেখেছিল।

দেখতে দেখতে পঁয়ষট্টি বছর পেরিয়ে গেল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, বছরের কি আর মাবাপ আ ছে? বছর পনের আগেই ঐ মহলটা রাজপ্রাসাদ ছিল। এখন সেটাই ভূতমহল হয়ে পড়েছে। কেউ কি কখনো ভেবেছে যে এই রাজা একদিন রাজ্যপাট ছেড়ে প্রজাদের থেকে বহুদূরে বিলেতে গিয়ে বসবাস করবে! অথচ আগেকার মানুষ বলত, পৃথিবী নড়লেও নাকি রাজসিংহাসন নড়ে না। রাজা তো ঈশ্বরের প্রতিরূপ। লোকে তখন রাজাকে দর্শন করে ঈশ্বরলাভের পুণ্য অর্জন করত। অথচ এখন কোনকিছুই আর কিছু নয়।

তখনকার কথা মনে পড়লে ধন্যি আজও কেমন স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে। কিছুদিন রাজবাড়িতে থেকেই সে অনুভব করে যে ওর মা বৃথাই ওকে না পাঠাতে চেয়ে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে! সে তো আর জানত না যে ওঁর মেয়ে এখানে কেমন বৈভবের মধ্যে বসবাস করবে, কী কাজ করবে, কী কী খাবে, কী কী পরবে!

রাজা ও রানী দু'জনেই ওকে বেশ পছন্দ করত। রানী তো সারাদিনে একবারও ওকে চোখের আড়াল হতে দিত না। রানীর নানা গোপন কথাও সে জানত। বিকেলে অন্দরমহলের পেছনে নদীতীরে তৈরি রাজউদ্যানে রাজা ও রানী ঘুরতে বেরুলে ধন্যি ওদের সঙ্গে থাকত। মাঝেমধ্যেই রাজা ও রানী শ্বেতপাথরের বেদীতে বসে ওকে গান শোনাতে বলত। ধন্যি ওদের সামনে ঘাসে বসে ওর মায়ের সঙ্গে মসলাকোটা কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে খেলার সময় নাচতে নাচতে গাওয়া গানগুলি গেয়ে শোনাত।

ক্রমে ধন্যি মহারাজের টুকটাক ফরমাইশ পালন করতে থাকে। মহারাজ ওকে 'খাস' দাসীর মর্যাদা দেন। এই সম্মান পেয়ে সে খুব খুশি। অন্য দাসীরা তাকে ঠাট্টা করে বলে, 'খাস'দেরকে অনেক সময় রাজারা অন্যভাবেও গ্রহণ করেন!

একথা শুনে অব্দি ওর বুক ধুকপুক করতে থাকে। মন উথালপাথাল। মহারাজের কাছে যেতে বুক কাঁপে। রাজা হয়তো এসব টের পেয়ে মজা করে কখনো ওর মুখের সামনে তুড়ি মারতেন। কখনো হাত দিয়ে আলতো করে ওর বাজুতে ধরেও কথা বলতেন। ধন্যি 'খাস্'এর তখন লজ্জায় কান গরম হয়ে যেত।

একদিন রানীর খুব শরীর খারাপ। সকাল থেকে জ্বর। সন্ধ্যেয় রাজবৈদ্যের দেওয়া ওষুধ খেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন। রাজামশাই ওঁর মাথার কাছে বসে থাকতে থাকতে দ্বিতীয় প্রহরে ঢুলতে শুরু করেন। দ্বিতীয় প্রহরের শেষে হঠাৎ তিনি উঠে রানীকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে দেখে নিজের কামরার দিকে এগিয়ে যান। দরজার কাছে ধন্যি দাঁড়িয়ে ছিল। রাজাকে দেখে সে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। রাজা মুচকি হেসে ওর কাঁধে হাত রাখেন। সে কেঁপে ওঠে। ওর কাঁধে হাত রেখেই রাজা বাইরে বেরিয়ে আসেন। ধন্যিও ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসে। রাজা এমনভাবে ওর কাঁধে হাত রাখেন যেন ওর সাহায্য ছাড়া তিনি আর চলতেই পারবেন না। শয়নকক্ষে পৌঁছনোর পর ধন্যি কর্তব্য অনুসারে রাজামশাইয়ের কোট খুলে দিতেই তিনি ওকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেন।

হে ঈশ্বর, ধন্যির জীবনের সেই রাত শেষ হল কেন? সেই রাতের পর সে আর বেঁচে থাকল কেন? সে তো মহারাজকে নিজের ইহলোক পরলোক সবকিছুই অর্পণ করে দিয়েছিল। নিজের জন্যে কিছুই বাঁচিয়ে রাখেনি। হয়তো সেজন্যেই এহেন রাত ওর জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি।

ভোর হওয়ার একটু আগে রাজা গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। ধন্যি ধীরে ধীরে নিজেকে ওঁর শরীর থেকে আলাদা করে। ওঠার আগে সে অনেকক্ষণ ধরে রাজাকে দেখে। অপলক তাকিয়ে থাকে। ওঁর থেকে দূরে সরে যেতে মন চায় না, কিন্তু রাত ফুরিয়ে গেছে। সে চাদর দিয়ে রাজার শরীর বুক অব্দি ঢেকে দেয়। নিজের জাম্মাকাপড় খুঁজে জড়ো করে। তারপর জামাকাপড় পরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে রানীর শয়নকক্ষে চলে আসে। ওকে কেউ দেখেনি। রানী তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হালকা আলোয় ঘুমিয়ে থাকা রানীকে অপরূপ লাগছিল। না জানি কেন তখন রানীর কপালে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। সে রানীর শিয়রের দিকে মেঝেতে বসে পালঙ্কের পায়ায় হেলান দিয়ে তোষকে মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে।

সকালে একটা মৃদু ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙে। রানী ওর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকাচ্ছিলেন। ওর ভীষণ লজ্জা লাগে। রানী স্নেহমাখা আওয়াজে বলেন, 'অনেক রাত অব্দি জেগে থাকতে হয়েছিল?'

'জী হ্যাঁ... জী হ্যাঁ'– ও ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দেয়– না জানি কখন চোখ লেগে গেছে! ভালই হয়েছে, দু'দ- বিশ্রাম তো হল, কম ধকল গেছে!

সেদিন দুপুরের পর থেকে সবকিছু আগের মতনই চলতে থাকে। পরদিন বিকেলে কিছুটা সুস্থ হলে রাজা রানীকে ধরে ধরে নদীতীরে উদ্যানে নিয়ে যান। ওঁরা শ্বেতপাথরের বেদীতে বসেন। রাজা রানীর কাঁধে হাত রাখেন। জ্বরে ভুগে রানী এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি রাজার গায়ে এলিয়ে বসে থাকেন। ধন্যি সামনের ঘাসে বসে। রানী ওকে গান

শোনাতে বলে। ধন্যি গাইতে শুরু করে–

ফাগুন মাসে উপত্যকাগুলি
ফুলে ফুলে ভরে গেছে
এই রূপ তুলনাহীন
তুমি সেই বাহারে আনমনা
আমার মন কেন উচাটন।

আজ ওর গানের সুর দরদভরা। রাজা ও রানী ভাবেন, আজ ধন্যির কী হল, আজ ওর আওয়াজ এত ভারী! ধন্যি তখন আপন মনে গাইছিল–

যেথা ডালে ডালে ফুল ফোটে না
তুমি কি সহজে তার দুঃখ বোঝ?
প্রকৃতির সবুজ সম্ভাবনায়
আমার মন কেন উচাটন।

রাজা ও রানী দু'জনেই অবাক। গানের শেষ কলি গাওয়ার আগেই ধন্যির দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। রাজা জিজ্ঞেস করেন, কী হল? রানী উঠে ওর কাছে এসে ডাকেন, ধন্যি...!

ধন্যি ওঁর দিকে মুচকি হেসে তাকায়, যেন সে বলছে, কিছু হয়নি, আপনারা চিন্তা করবেন না!

কিন্তু ধন্যি ওদের বেশিদিন নিশ্চিন্ত রাখতে পারেনি। অদৃষ্টের পরিহাসে ওঁর শরীরে নানারকম পরিবর্তন শুরু হয়। অনেক কষ্টে সে কয়েক মাস গোপন রাখে কিন্তু এরপর একদিন সে নিজেই বলতে বাধ্য হয়। সে রানীর কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ওর কথা শুনে রানী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মহারাজের অবস্থা হয়ে পড়ে সাপে কাটা মানুষের মত।

সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে রানী নিঃসন্তানই রয়ে গেছেন কিন্তু 'খাস'ধন্যির পা ভারী হয়ে গেছে। দাবানলের মত খবর ছড়িয়ে পড়ে। লোকে বলতে শুরু করে যে এবার বুঝি দাসীপুত্র 'ছৎরোড়ে' রাজা হবে!

দস্তুর মোতাবেক ধন্যিকে রাজমহলের লাগোয়া একটি হাবেলি দেওয়া হল। এই সেই হাবেলি... ধন্যির হাবেলি! আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে সে এই হাবেলিতে প্রথম পা রাখে। তারপর আর একবারও এর বাইরে পা রাখেনি। শুরুরর দিকে মাঝেমধ্যে সে ছাদে উঠে বসত। এমনি পূর্ণিমা রাতগুলিতে ছাদে উঠে ঠিক এইখানে বসে অনেকক্ষণ ধরে রাজমহলের দিকে তাকিয়ে থাকত। ঐ মহল ওকে ভুলে গেলেও সে কখনো মহলের অমঙ্গল চায়নি। শুধু করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে মহারাজদর্শনের প্রার্থনা করত, ঠাকুর, একটিবার ওঁকে আমার সামনে এনে দাও, শুধু দু'চোখ ভরে দেখব!

কিন্তু সামনে আসা তো দূরের কথা, দূর থেকে দেখার সুযোগও একটিবার আসেনি। সে যেন গলায় বড়শির কাঁটা বেঁধা একটি মাছ, যাকে জল থেকে তোলার কেউ নেই অথচ কাঁটা বিঁধে থাকায় ছটফট করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

সে শয়নে স্বপনে সবসময় রাজার কথাই ভাবত। সে ভাবত, মহারাজ আমার না হলে কী হবে, ওঁর সন্তানের মা তো হব! ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে, রানী যতই মহারানী হোন না কেন, রাজপুত্রের মা তো আমিই হব!

এসব ভেবে ওর বুক গর্বে ফুলে উঠত কিন্তু পরমুহূর্তেই সে অনুভব করত তার ভাবনার অসারতা। সে যতই নিজের শরীরে মহারাজের অংশ লালন করুক না কেন, কোনদিনই রাজমহলে ওর স্থান হবে না।

অবশেষে একদিন রাজা ওকে দেখতে এলেন। সে হাসবে না কাঁদবে? সে তো এও জানে না যে মহারাজ ওর উপর রেগে আছেন কিনা! তিনি জিজ্ঞেস করেন,

– কোন কিছু চাই তোমার?

সে কেমন করে বলে ওর কী চাই! সে কেবল ঐ দেবপ্রতিম মানুষটিকে দু'চোখ ভরে দেখছিল। দীর্ঘদিন ধরে ঈশ্বরের কাছে সে তো শুধু রাজাকে একটিবার দু'চোখ ভরে দেখার প্রার্থনাই জানিয়ে আসছিল। একটু পরেই রাজামশাই উঠে দাঁড়ালেন।

ধন্যি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সে জোরে কেঁদে উঠে রাজার পা জড়িয়ে বসে কাঁদতে থাকে। রাজা ওকে দু'হাত দিয়ে তুলে দাঁড় করান। বুকে জড়িয়ে ধরে একটি চুমু খান। তারপর নিজের হাতে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন, এসব পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে!

তারপর ওর জীবনে আসে সেই ঘন অন্ধকার রাত। প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে বারবার সংজ্ঞা হারাচ্ছিল। যন্ত্রণার সেই অকুল পাথারে সে একা অসহায় প্রায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়েও প্রবল জিজীবিষায় সাঁতার কেটে যাচ্ছিল। সে জানত যে এই যন্ত্রণার নদীতীরে একটি মনোরম সরোবর রয়েছে, যেখানে সে পাবে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্ম আহরণের জন্যে সে ওই যন্ত্রণার উত্তাল স্রোতে সাঁতার কাটছিল। সাঁতার কাটতে কাটতে জীবন্মৃত্যুর শেষ সীমায় পৌঁছে সে সফল হয়।

তখুনি মহারাজকে খবর পাঠানো হয় কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছনোর আগেই ধন্যির চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায়। এত কষ্টে পাওয়া পদ্মফুলটি সে হারিয়ে ফেলে। এক প্রবল ধাক্কায় সে ককিয়ে ওঠে। সে জ্ঞান হারায়। দাই ও দাসীরা প্রমাদ গোনে।

সকাল হতেই সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে খাসদাসীর ছেলে জন্মাতেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। অনেকে বলাবলি করে যে এই হত্যার পেছনে স্বয়ং মহারাজের হাত রয়েছে। মহারাজের সমর্থকরা বলে, এই ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন শ্যামনগরের অধিপতি রানীর বাবা রাজা কেসরী সিংহ।

ধন্যির যখন জ্ঞান ফেরে ওর কোল তখন ফাঁকা। অভাগিনী কারো উপর সন্দেহ করেনি। না মহারাজের উপর, না মহারানীর উপর। সেই সময় শুধু মায়ের কথা, আকুল কান্নার দৃশ্য চোখে ভাসছিল। এজন্যেই হয়তো মা ওকে সেই জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে নিজে এত অত্যাচার সহ্য করেছিল। ধন্যির এমন পরিণতির কথা মা হয়তো আগেই আঁচ করেছিল। ধন্যি নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে ওঠে, ব্যস মা, এখন তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো তোমার মেয়ের উপর যে অন্যায় হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে, এখন আর কোন বিপদ আসার বাকি নেই– চরম যন্ত্রণার দিনগুলি পেরিয়ে গেছে– এখন শুধু সারাজীবন হা হুতাশ করা–

রাজবাড়ি থেকে প্রস্তাব আসে ধন্যি চাইলে আবার 'খাসদাসী'র কাজে ফিরে যেতে পারে কিন্তু ধন্যি যায়নি। একবারের জন্যেও সে রাজবাড়িতে পা রাখেনি। সে নিজেকে লোকের হাসিঠাট্টার উপাদান করে তুলতে চায়নি। সে ভাবে, যাই হোক না কেন আমি তো রাজার বড় ছেলেকে জন্ম দিয়েছিলাম! একটি পদ্মফুল তো চোখ মেলেছিল! কেউ সেই ফুলকে মাটিতে আছড়ে শেষ করে দিলেও যা সত্য তাকে তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না!

এমনি করেই কালের মহাসমুদ্রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ডুবে যায়। কিন্তু ধন্যি আর কোনদিন রাজমহলে যায়নি।

মহারাজ ক্রমে আরো দু'টি বিয়ে করেন। বড়রানীর জন্যে ধন্যির খুব কষ্ট হয় কিন্তু সে চুপ থাকে। কেউ ওর সহানুভূতি চায় না, ওর দুঃখের খবরও কেউ রাখে না। ওর অবস্থা শুকনোপ্রায় ঝর্নার মত, কোন তৃষ্ণার্ত পথিক আর সেদিকে ফিরেও তাকায় না। জীবনের সমস্ত পথ ক্রমে ওর থেকে দূরে চলে গেছে, এখন আর কোন পথচারী সেই পথ মাড়ায় না।

একদিন সে শোনে মেজরানীর কোল আলো করে একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। সমস্ত রাজ্যে খুশির ঢেউ খেলে যায়। ধন্যিও পিছিয়ে থাকে না, সে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করায়, নিজের হাবেলিকে দীপমালায় সাজিয়ে তোলে কিন্তু ছাদে দাঁড়িয়ে সেই দীপমালা দেখতে দেখতে এক আশ্চর্যরকম অন্তঃসারশূন্যতায় ওর মন ছেয়ে যায়। রাজবাড়ির দীপমালার পাশে এই হাবেলির দীপমালা কত তুচ্ছ ও ম্লান! এই হাবেলির দীপমালার দিকে কি কেউ একটিবার উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখছে? নিঃস্ব মানুষের দীপমালাও কি রিক্ততাভরা? এদিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

দেখতে দেখতে রাজকুমার বড় হয়ে ওঠে। একদিন ধন্যি শোনে যে মহারাজ ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়ছেন। তারপর সে আয়নায় নিজের মাথায়ও রূপোলি ছোঁয়া আবিষ্কার করে মিটিমিটি হাসতে থাকে। সে ভাবে, যাই হোক না কেন, জীবনের সফরে দূরে থেকেও সে তো মহারাজের পাশাপাশিই এগিয়ে চলেছে। সব সময় সে সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ আর চোখে কাজল পরত। মালিনী রোজ সুগন্ধী ফুলের মালা দিয়ে যেত। ফুলের সৌরভে সন্ধ্যাগুলি ভরে থাকত, যদিও ঘুমোতে হত ফাঁকা বিছানায়। নিজের অজান্তেই এভাবে কখন যেন আরেকটা প্রতারক রাত ওকে ঠকিয়ে ভোরের আলোয় মিশে যেত আর দিনগুলি ছুটে চলত ভবিষ্যতের দিকে ধনুকের থেকে ছোঁড়া

তীরের মত অহর্নিশ।

তারপর একদিন শুনল যে মহারাজ পোলো খেলতে খেলতে হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছেন। এখন মৃত্যুর সঙ্গে বদ্যির লড়াই চলছে। ইংরেজ ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়েছে। খবর শুনে ধন্যি দৌড়ে বেরোয়, কিন্তু হাবেলির চৌহদ্দি পেরুনোর আগেই ওর পা থেমে যায়। মহারাজের কাছে ছুটে যাওয়ার অধিকার ওকে কে দিয়েছে? কেউ কি ওকে মনে রেখেছে? ও কাকে কী বলবে? ক্কিই বা বল বে? সে শ্লথ পায়ে ফিরে এসে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে।

মহারাজের স্বর্গবাস হল। মাথার উপর থেকে ছায়াটা সরে গেল অথচ ও একবার চোখের দেখাটিও দেখতে পেল না। ধন্যির সঙ্গে পুরো রাজ্যই সেদিন বিধবা হয়ে গেল। মাসাধিককাল ধরে শোকপালন হল। তারপর রাজকুমার সুখদেব সিংহ রাজা হলে দেশের বৈধব্য ঘুচল কিন্তু এরপর থেকে ধন্যির আভরণ হল শুধু শ্বেতবস্ত্র। কাজল, সিঁদুর, গজরা, হার সবকিছু ওর থেকে দূরে চলে গেল। পরবর্তী পনের কুড়ি বছরে একে একে তিনরানীর মৃত্যু সংবাদ ছাড়া মহলের আর কোন খবর ওর কাছে পৌঁছয়নি।

একদিন শুনল যে ইংরেজরা হিন্দুস্তান ছেড়ে বিলেতে ফিরে গেছে। সে ভাবে, গেছে তো গেছে– ওরা নিজেই দেশেই তো ফিরে গেছে, বেশ করেছে!

আবার একদিন শুনল যে হিন্দুস্তানের সমস্ত রাজ্মমহারাজা কে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে। ওদের রাজত্ব এখন ভারত সরকারের অধীনে চলে গেছে। ধন্যির বিশ্বাস হচ্ছিল না। তা কেমন করে হয়? পৃথিবী নড়লেও নাকি রাজসিংহাসন নড়ে না! রাজারা যে ঈশ্বরের প্রতিরূপ! ওকে বিশ্বাস করতেই হয় যখন অবাক হয়ে দেখে যে রাজবাড়ির শীর্ষে উড্ডীন রাজপতাকাটাকেও কেউ নীরবে নামিয়ে নিয়েছে।

রাজমহলেই আর কেউ নেই। মহারাজ সুখদেব সিংহ নাকি সপরিবারে লন্ডন চলে গেছেন। সেখানে তিনি নাকি একটি বড় পাঁচতারা হোটেল খুলেছেন। রাজবাড়ি জনমানবশূন্য হয়ে পড়লেও ধন্যির হাবেলি তেমনি রয়ে গেল। এরপর থেকে আরেকটা দুঃখ ক্রমে ধন্যিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। রাজমহলে কেউ নেই অথচ হাবেলিতে ধন্যি কি করে আছে? তাহলে কি সত্যি সত্যি ওর সঙ্গে রাজপরিবারের কোনই সম্পর্ক নেই? বুক হু হু করে ওঠে। মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে ওঠে, আদৌ কোনদিন রাজপরিবারের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক ছিল কি? সে তো মিছিমিছি সারাজীবন ধরে নিজে নিজে এক অবাস্তব সম্পর্কের জাল বুনে গেছে। কে বলে যে সে এক রাজকুমারের মা? সে তো কেবল এক দাসী– রাজার রক্ষিতা মাত্র! মালিক একবার ভুল করে নিজের এঁটো খাইয়ে দিলে তো আর কেউ মালকিন হয়ে যায় না!

সারাজীবন ভ্রমের জাল বোনার দুঃখই ওকে আজকাল সবচাইতে বেশি কষ্ট দেয়। এই মিথ্যের জালেই সে নিজে আটকে গেছে। ওর কি এখন এই ভুলভুলাইয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়া উচিত?

– ন্মনা! এখন আমি আর এই জাল ছিঁ ড়ে বেরন্নতে পারি না– তাহলে কী নিয়ে বাঁচব?

এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না– ওর দেওয়ালগুলিও এসব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারবে না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে যদি এই ভেবে মরে যে সারাজীবন সে ধোঁকার জালে জড়িয়ে ছিল তাহলে হয়তো মৃত্যুর পরও ওর আত্মা এই হাবেলির বাইরে বেরুতে পারবে না। যুগ যুগ ধরে এই হাবেলির দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ছটফট করে বেড়াবে।

আজ সে অনেক বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছিল। সারারাত বুক ধড়ফড় করছিল। ঘুম আসছিল না। শেষরাতের দিকে ঘুমিয়েছে। হঠাৎ কান্নার শব্দে ধড়মড়িয়ে ওঠে। এ কেমন আওয়াজ? চোখ মেলে দেখে ওর সামনে দু'তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে। সে তো ওদের কাউকে চেনে না! ওদের মধ্যে একজন কাঁদোকাঁদো স্বরে বলে, ধন্যি মাঈ! শিগগীর ওঠো, বাইরে এসো! ধন্যি কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক চোখে ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সেই মহিলা বলে, ধন্যি মাঈ, কাল রাতে বিলেতে রাজা সুখদেব সিংহ দেহ রেখেছেন। ধন্যির পেটে মোচড় দেয়। রাজা সুখদেব সিংহ বিলেত গেছে সেও তো বছর দশেক আগে! সে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে– ওঁর কী হয়েছিল?

এই প্রতিবেশীসুলভ প্রশ্নে মহিলারা যেন কিছুটা নিরাশ হয়। ওরা হয়তো ভেবেছিল রাজার মৃত্যুর খবর শুনেই ধন্যি মাঈ বুক চাপড়ে বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করবে। বাইরে থেকে মেয়েদের সমবেত কান্নার সুর শোনা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় মহিলা এগিয়ে এসে বলে, রেডিওর খবরে বলেছে হার্ট অ্যাটাক! মাঈ, শিগগীর বাইরে এসো, শহরের সমস্ত মহিলা বাইরে জড়ো হয়েছে।

ধন্যি বুঝতে পারে না কেন এত মহিলা হাবেলির বাইরে জড়ো হয়েছে। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। নেতৃস্থানীয়া প্রথম মহিলাটি এবার ওর খুব কাছে আসে। সে হয়তো ধন্যির না বলা প্রশ্ন বুঝতে পেরেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে বলে, মানুষের মনে আজও রাজা ও রাজপরিবারের প্রতি ভালবাসা রয়েছে! রাজার মৃত্যুর খবরে মানুষ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ অনাথ হয়ে পড়েছে। আমরা এখন নিজেদের মনের দুঃখ কাকে জানাই? ধন্যি মাঈ, তুমি তো রাজার মায়ের মত, তুমি ছাড়া এখানে রাজপরিবারের আর কে আছে? এস, বাইরে এসে দেখ, মহিলারা কেমন শোকে ডুবে আছে, ওরা তোমার কাছে আফসোস করতে এসেছে।

ধন্যির সারা শরীর কেঁপে ওঠে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলা ওকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করায়। তারপর ওরাই ওকে ধরে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। ধন্যি বাইরে বেরিয়ে দেখে ওর হাবেলির সামনে চিরকাল খাঁখা করা প্রশস্ত গলিপথে কয়েকহাজার মহিলার মাথা গিজগিজ করছে। এত ভীড় দেখে সে হা হয়ে যায়। তারপর হঠাৎই ওর নাভি থেকে একটা কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। সে হেঁচকি তুলে সজোরে কেঁদে ওঠে। তারপর নিজের বুক চাপড়াতে শুরু করে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহিলা তখন বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ পর মহিলারা একে একে থেমে যায়। নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে কিন্তু ধন্যি সমানে বুক চাপড়ে বিলাপ করতে থাকে। ওর ভাষা কেউ বুঝতে পারে না। সারাজীবনের যে সমস্ত গ্লানি ওর শরীর ও যৌবন গলিয়ে নিংড়ে নিয়েছে, ওর অস্থিমজ্জা কুরে কুরে খেয়েছে স্লে সব গ্লানি ও দুঃখের কথা ভেবে কাঁদতে থাকে। আজ এতবছর পর ওর জীবন সার্থক হয়েছে। আজ ওর বুক চাপড়াতে কোন ক্লান্তি কেমন করে হবে?

বিকেল অব্দি দূর দূরান্ত থেকে মহিলারা আফসোস করতে আসে। আসতেই থাকে। এই প্রতিষ্ঠা, এই সম্মান ধন্যি কোথায় রাখবে?

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় সে ফুলের মত হালকা হয়ে পড়ে। যুগযুগা স্তরের জমা হওয়া সমস্ত্ম দুঃখ সারাদিনের কান্নায় ধুয়ে মুছে যায়। এখন স্লেও এই দিগ স্তপ্রসারী জ্যোৎস্নার মত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে পড়তে চায়, নিঃশেষ হয়ে যেতে চায়।

জ্যোৎস্নার মায়াবি আলোয় সে আর একবার রাজবাড়ির দিকে তাকায়, ঐ মহলেই তো সে নিজের সর্বস্ব অর্পণ করে দিয়েছিল! ওর ঠোঁট কাঁপে। সে বিড়বিড় করে বলে, মহারাজ, এখন তো তুমি আমাকে কাছে টেনে নাও!

ওর চোখের সামনে কুহক ছড়িয়ে পড়ে। ঘাড়টা ধীরে ধীরে একপাশে এলিয়ে পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কমে যায়, যেন কোন ডিঙ্গি নৌকা ধীরে ধীরে শান্ত সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। আকাশের মেঘ ও চাঁদ ছাড়া কেউ এই দৃশ্য দেখছে না। ধন্যির চোখের জ্যোতি বুজে গেলে মেঘেরা চাঁদকে ঢেকে দেয় আর রাত এক নিঝুম গহন অন্ধকারে ডুবে যায়।

মূল ডোগরী থেকে অনুবাদ **শ্যামল ভট্টাচার্য**

লেখক পরিচিতি

ডোগরী ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ছোটগল্পকার বেদ রাহীর জন্ম জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু উপত্যকায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। ডোগরী ছাড়াও তিনি হিন্দিতে বহু গল্পউপন ্যাস লিখেছেন। তিনি বোম্বের চলচ্চিত্রজগতে চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে বহু দিন সম্পৃক্ত ছিলেন। মুম্বইয়ের আঁধেরী এলাকায় বসবাসকারী এই গুণী লেখক ৪টি চলচ্চিত্র ও বহু টিভি সিরিয়াল পরিচালনা এবং ১৫টির অধিক বই লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে *আহলে* (ছোটগল্প); *হাড়, বেদিতে পত্তন; গড় জুন* (উপন্যাস); হিন্দি ছোটগল্প সংকলন *দারোঁ* অন্যতম।

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

এক সময় জ্ঞান ফেরে জয়নুল মিয়ার।

চোখ খুলে কোন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখার ঘোরে আবার নিজের চোখ বুঁজে ফেলে। বুঝতে পারে না ওর কি হয়েছে, কেনই বা এমন করে পাঁচ মেয়ে তার চারপাশে বসে আছে। মৃদুকণ্ঠে শুনতে পায় একজনের ডাক, বাজান।

জয়নুল ডাকটা উপভোগ করে। চট করে চোখ খোলে না। বুঝতে পারে বাজান ডাক তার ভেতরে মৃদু স্রোতের মত বইছে। বুকের ভেতরে আনন্দের ঢেউ গড়ায়। ভুলতে থাকে রাশিদুনের কঠিন কথা। নিজেকেই বলে, রাশিদুন আমার কোন দুঃখ নাই। তোমার দুঃখ আমার জীবন কেড়ে নেয় রাশিদুন। আমি আমার ভুলের মাশুল নিয়ে কবরে যাব। আমার সামনে দোজখের দরজা খোলা থাকবে। তাতে আমার দুঃখ নাই। জীবনকালে মেয়েরা আমাকে বেহেস্তের সুখ দিয়েছে এতেই আমি খুশি রাশিদুন। আলাহর কাছে আমি আর কিছু চাই না।

জয়নুল মিয়া বড় করে শ্বাস ফেলে। তখন কেউ ডাকে, বাজান। আবার সেই মৃদুমন্দ

ডাক! জয়নুল চোখ বড় করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। শিউলি হাত ধরে বলে, বাজান এখন কেমন লাগে? শরীর ঠিক আছে বাজান?

বকুল বলে, বাজান পানি খাবেন?

হাস্নুহেনা মৃদুস্বরে বলে, আম্মা কাজটা ঠিক করে নাই।

পদ্ম মুখ ঝামটা দেয় ওকে।

তুমি বেশি কথা বলবে না হাস্নুবু।

চম্পাও পদ্মর কথার রেশ ধরে বলে, বাজান যা বোঝার বুঝবে। তুমি কথা বল কেন?

জয়নুল মিয়া কারো কথার কোন উত্তর দেয় না। খুকখুক করে কাশে। এদিকওদিক মাথা ঘোরায়। প্রবল অস্বস্থিতে বুকের দম বুঝি এক জায়গায় এসে থেমে যায়। উঠতে যায়, কিন্তু উঠতে পারে না। আবার ধপ করে বসে পড়ে। চোখমুখ কুঁচকে থাকে। ভাবে, এ জীবনের দায় বড় কষ্টের কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। সামলে তো নিতেই হবে। ওতো নিজেই জানে না যে কতটা পথ আরও হাঁটতে হবে। ও হাত বাড়িয়ে বারান্দার খুঁটি ধরে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েরা ওকে ঘিরে ধরে বলে, বাজান একটু বসেন।

বসব? ক্যান?

আপনার মাথা ঘুরাচ্ছে।

তোমরা বলছ?

হ্যাঁ, আমরা বলছি। আপনাকে কেমন জানি দেখাচ্ছে।

কেমন দেখাচ্ছে মাগো?

হাস্নুহেনা গলা উঁচু করে বলে, মায়ের বকা খেয়ে আপনি কাবু হয়ে গেছেন। আপনার গায়ে জোর নাই বাজান।

শিউলি কষে ধমক দিয়ে বলে, চুপ কর শয়তান। যা বাজানের জন্য পানি নিয়ে আয়।

বকুল ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে, আর বেশি কথা বললে আমরা সব বোনেরা গলা চেপে মেরে ফেলব তোকে। ভারী তো একটা ঘটনা দেখে এসে এখন মাতব্বরী করছে।

এমন হাজার হাজার ঘটনা ঘটে সারা দেশে। মা কয়টা দেখতে পায়? যা পানি আনতে যা। বাজান বসেন।

হাস্নুহেনা কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে যায়। জয়নুল মিয়া অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে, ওতো ঠিকই বলেছে মায়েরা। আমিতো তোমাদের মায়ের বকা খেয়েছি। বকা খাওয়ার মত ঘটনাতো আমিই ঘটিয়েছি। তবে আমাকে নিয়ে তোমরা ভয় পেয়ো না। কাল সকালে আমি পান্তা খেয়ে ধান কাটতে যাব। ঘরে ধান আসবে। বাড়িতে নতুন ধানের গন্ধ মম কর বে।

আপনি বসেন বাজান। পানি খান।

জয়নুল মিয়া মাদুরের ওপর বসে। পানি খায়। এক গ্লাস খেয়ে আর এক গ্লাস চায়। হাস্নুহেনা জগভর্তি পানি এনেছিল। বাবাকে আরেক গ্লাস দেয়। ওর ভেতরে জেদ কাজ করছে। পানি ও সবাইকে খাওয়াবে।

বাবার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে আবার পানি ঢেলে প্রথমে শিউলিকে দেয়। শিউলি চোখ গরম করে বলে, আমিতো তোর কাছে পানি চাইনি।

চাওনি তাতো আমি জানি। দিচ্ছি যখন খাও। আমি সবাইকে পানি খাওয়াব।

জয়নুল মিয়া গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, খাও মা। আমাদের সবার বুক শুকিয়ে গেছে। পানি খেলে ভাল লাগবে।

শিউলি গম্ভীর হয়ে বলে, পানি তো খাওয়া যায় না। পানি পান করতে হয় বাজান।

বুঝেছি। তুমিতো স্কুল মাস্টারনি।

হাস্নুহেনা গ্লাসটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নাও বুবু। তিয়াস মিটাও। শুকনো বুকে ঘুম আসবে না। বাজানের মত অজ্ঞান হয়ে যেতে হবে।

শিউলি গ্লাসটি ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে একটানে পুরো গ্লাস শেষ করে। বকুলের দিকে এক গস্নাস পানি দিলে ও কোন কথা না বলেই গ্লাস শেষ করে। চম্পা ও পদ্মও তাই করে। সবশেষে হাস্নুহেনা নিজেও এক গ্লাস শেষ করে।

জয়নুল সবার দিকে ফিরে তাকায়। বুঝতে পারে তার ভেতরটা ভরে গেছে। গায়ে বল ফিরে পাচ্ছে। মৃদু হেসে বলে, তোমাদের বুকে এত তিয়াস কেন গো মা? তোমরাতো আমার মত বুড়ো হওনি? তাহলে কার তিয়াস?

আপনার জন্য তিয়াস বাজান।

আম্মার জন্য তিয়াস বাজান।

আমাদের জন্যও তিয়াস বাজান।

জয়নুলের মাথা প্রথমে বুকের দিকে নেমে গিয়েছিল। পরে মেয়েদের নিজের জন্য তিয়াস পাওয়ার কথা শুনে বুক ধড়ফড় করে উঠলেও সরাসরি ওদের দিকে তাকায়।

তোমাদের কি হয়েছে মায়েরা?

প্রত্যেকে মাথা নেড়ে বলে, কিছু হয় নাই বাজান।

তাহলে তোমাদের বুকে তিয়াস কেন?

তিয়াসতো থাকবে বাজান। আমাদের তিয়াস থাকবে না কেন? আপনি বলেন? জয়নুল মিয়া বোকার মত তাকিয়ে থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাধ্য তো তার নেই। ওই অবস্থায় ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তোমাদের তিয়াসতো থাকবেই। থাকবে না কেন? ওহ্, আলাহ্ রে, আমারে মাপ করে দাও তোমরা। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতটুকু খানিকটা উঁচু করে বলে, তোমরা সুখী হও মায়েরা। আলাহমাবুদ তোমাদের সুখে রাখুক।

কথা শেষ করে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে দাঁড়ায় জয়নুল। ভাবে, হাঁটতে ভালই লাগছে। শরীরে দুর্বলতা নেই। নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসে। যে কয়দিন বাঁচবে সে কয়দিন নিজের মত করে বাঁচতে পারবে। এই আত্মবিশ্বাসে দ্রুতপায়ে হেঁটে বাড়ির বাইরে আসে। দেখতে পায়, রাস্তায় লোক চলাচল বেশি। মনে পড়ে আজ হাটবার। মানুষের কথায় মৌমাছির মত গুঞ্জন চারদিকে। জয়নুল মিয়া হাটে যাবে বলে মন স্থির করে। হাট থেকে জীয়ল মাছ কিনবে। রাশিদুনের পছন্দ ছিল শিং-মাগুর। বড় একটি মাটির হাঁড়িতে মাছগুলো জিইয়ে রাখত। বলত, লোকে পুকুর থেকে মাছ ধরে। আমার আছে হাঁড়িপুকুর। আমি হাঁড়ি-পুকুরের মাছ ধরে রান্না করি। শিউলির বাপ পেট ভরে সেই মাছ দিয়ে ভাত খায়। প্রতিবেশীরা তার কথায় হাসত। বলত, তুই কি স্বামীর ন্যওটা? পাগল একটা। কপালে তোর দুঃখ আছে।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়নুল মিয়া। ভাবে, থাক হাটে গিয়ে লাভ নাই। কি হবে? কার জন্য মাছ কেনা? পরক্ষণে নিজেকে ধমকায়, মেয়েরা আছে না? আবার নিজেকেই বলে, জীয়ল মাছ কিনে কি হবে ওদের তো হাঁড়ির পুকুর নাই! জয়নুল মিয়া আবার বোকা হয়ে যায়। তারপর সামনে পা বাড়ায়। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, মেয়েরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ওরা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে না যে, বাজান কোথায় যান? আপনি কখন বাড়িতে আসবেন বাজান? আজ অমাবস্যার রাত। ঘোর অমাবস্যা। ওর ইচ্ছে

হয় যে মেয়েরা ওকে ডেকে বলুক, বাজান অমাবস্যার রাতে হাটে যাওয়া লাগবে না। বাজান, আপনি ঘরে আসেন কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে কোন ডাক আসে না। যেন অমাবস্যা ওদের গিলে ফেলেছে। ওদের সামনে আলো নেই। জয়নুল মিয়া বিরক্ত হয়ে পা বাড়ায়, কেন যে এমন সময় আসে মানুষের জীবনে! দিনগুলো কেন যে শুধু ঝকঝকে পূর্ণিমা হয় না! জয়নুল মিয়া ঠিক করে রাতে বাড়ি ফিরবে না। হয় গাছতলায় শুয়ে থাকবে নয়তো বাজারের কোন বারান্দায়। ওর ভাবনা ওকে তাড়া দিলে ও কোনদিকে না তাকিয়ে সামনে পা বাড়ায়। অমাবস্যার অন্ধকার তাকে খেয়ে ফেলুক এমন এক অভিমান নিয়ে কাঁদতে শুরু করে জয়নুল মিয়া। হাহা ধ্বনি তার চারপাশে তোলপাড় করে। স্মৃতিবি স্মৃতির ভাবনায় প্রবল কান্না থামাতে চায় না জয়নুল মিয়া। কাঁদতে কাঁদতে পা বাড়ায় সামনে।

চার.

বকুলের সউদিতে যাওয়ার সব আয়োজন শেষ হয়। মায়ের গয়না বিক্রির টাকা, বোনের জমানো টাকা, জয়নুলের ধার করা টাকা দিয়ে মিটে যায় খরচ। যেখানে যা করার দরকার তার সবটুকু করে জয়নুল সহযোগিতা করে। কিন্তু মুখে হাসি নেই। ভুরু কুঁচকে থাকে। বকুল বাবার ঘাড়ে হাত রেখে বলে, বাজান আপনার কি মন খারাপ?

মন খারাপ হবে কেন?

আপনার জন্য বেলের শরবত এনেছি। নেন।

তিয়াস নাই।

বেলের শরবতের জন্য তিয়াস লাগে না বাজান। নেন, গাস্টা নেন। শেষ করেন। আপনি গাস না নিলে আমি সবাইকে ডাকব। সব বোন আপনার সামনে বসলে আপনার তিয়াস লাগব। আপনি তখন ঢকঢক করে গাস শেষ করবেন।

জয়নুল মিয়া হাত বাড়ায়, দাও তোমার গাস দাও।

জয়নুল মিয়া শরবতের গাস শেষ করলে বকুল বলে, বাজান আপনার মন খারাপ?

হ্যাঁ মা, খুব মন খারাপ! তোমার মা দিল গয়না। আমি করলাম দেনা।

আপনের গয়না থাকলে আপনিও দিতেন বাজান। আপনিতো জমি বেচে টাকা জোগাড় করতে চাইলেন। আমরা তো মানা করলাম। বললাম, দেনা করেন। আমি তো রোজগার করব বাজান। টাকা পাঠালে আপনি দেনা শোধ করবেন।

জয়নুল মিয়া মেয়ের কথায় চুপ করে থাকে। নিজেকে খুব অসহায় মনে করে। ভাবে, এ জীবনে কতকিছুই যে দেখা হল। দেখার আর বেশি কিছু বাকি নাই।

বকুল আবার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, বাজান আমি টাকা পাঠালে আপনি দালান উঠানোর চিন্তা করবেন। বোনদের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করবেন। মাকেও ডেকে এনে বলবেন যে, দেখ, এইখানে পাকা ঘর উঠাব। তোমার কোন চিন্তা থাকলে বল।

তোমার মাকে?

হ্যাঁ, মাকে তো বলবেনই।

তোমার মা কি এই বাড়ির কেউ?

মা যদি এই বাড়ির কেউ না তাহলে আমরা কে? আমরা কোথা থেকে আসলাম? কোন পেত্নি আমাদের এখানে রেখে গেল?

বকুলের কণ্ঠস্বর প্রথমে রাগত ছিল, পরে মিইয়ে যায়। শেষে ফাঁচফ্যাঁচ কান্নার ধ্বনি ওঠে। জয়নুল মৃদু ধমক দিয়ে বলে, থাম। কাঁদুনি মেয়ে হতে হবে না। নিজের দুঃখের বোঝায় চলতে পারি না, মেয়েদের দুঃখের বোঝা নিব কোথায়? ঘাড়তো একটাই মাত্র।

বকুল বাবার কথায় দুঃখ পায় কিন্তু মুখে কিছু বলে বাবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। বড় অবসন্ন বোধ করে। বাবার দিকে তাকাতে পারে না। উঠোনের গাছের মাথায় তাকায়। দেখে কাকে বাসা বাঁধছে। খড়কুটো জড়ো করছে। উড়ে যাচ্ছে একজন, আবার উড়ে আসছে আর একজন। দু'জনের বাসা হবে। তারপর ডিম পাড়বে। বেশ মজার একটি দৃশ্য। বকুল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন, ওর নিজের স্বপ্নের দৃশ্য দেখছে। এভাবেই ওর ঘর হবে। ভালবাসার ঘর। জয়নুল ওর মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কোন কিছু না জেনেই বলে, সোহেল ছেলেটা খুব ভাল। তোর জন্য অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে। কাজটা গুছিয়ে দিয়েছে। আলাহ ছেলেটার হায়াত দারাজ করুক।

বকুল নিশ্চুপ হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ধুকপুক ধ্বনি। নিজের কানে নিজের বুকের ধ্বনি শোনার সময় এখন। জীবনের সবচেয়ে মধুরতম সময়। জয়নুল মিয়া আবার বলে, ও তোর সঙ্গে যাবে সেজন্য আমি আরও খুশি।

বকুল হাঁপ ছেড়ে বলে, ও মালিকের দোকানে কাজ করবে। আমি বাসায়।

ভাল ব্যবস্থা করেছে। ও তোকে বিয়ে করার কথা কিছু বলেছে মা?

বকুল চমকে ওঠে বলে, না তো বাবা কিছু বলেনি।

জয়নুল মিয়ার ঘাড় নিচু হয়ে যায়। নিজেকে ধমকায়। মেয়েটাকে এমন করে জিজ্ঞেস করা ঠিক হয়নি। মাঝে মাঝে এমন বোকামি হয়ে যায়! সেজন্য মেয়েরা কখনো রাগ করে। তারপরও বাবার জন্য ওদের মায়ার কমতি নেই! একসময় ঘাড় তুলে বলে, বিদেশ বিভুঁয়ে কিছু হলে ছেলেটা তোকে দেখবে তো মা? ওর ওপর তোর এমন ভরসা আছে?

আছে বাবা! মালিকওতো এই দেশের। তার বৌ ছেলেমেয়ে আছে। আমার মনে হয় বিপদে পড়ব না।

আলাহর কাছে সেই দোয়া করি। আলাহ যেন তোকে বালা-মছিবতের উপরে রাখে। আমার পরাণটা তোর সঙ্গে থাকবে।

আপনার পরাণ কয়টা বাজান? বকুলের চোখেমুখে কৌতুকের হাসি।

জয়নুল মিয়াও হেসে বলে, আমার পরাণ পাঁচটা। তুই কি বলতে চেয়েছিস তা আমি বুঝেছি রে মা। যে বাপের পাঁচটা মেয়ে তার পরাণ কি একটা হয়!

তাতো ঠিকই। বকুল মৃদু হেসে বাবার হাত জড়িয়ে ধরে। পরমুহূর্তে ওর দৃষ্টি চলে যায় বাড়ির দরজায়। ওর ছোট মামা খলিলুরের মাথা দেখা যায়। ওরা জানে ওদের এই মামার উচ্চতা বাড়ির দরজার সমান সমান। মাথার চুল কোঁকড়া। কিছু চুল মাথার ওপর খাড়া হয়ে থাকে, কিছু বিনুনির মত পাকানো। মামা কেন এসেছে? মায়ের কোন খবর আছে কি?

বাজান মামা। দরজার দিকে তাকান।

ও একলাফে উঠোন পার হয়ে দরজার কাছে আসে। দরজা খোলে। ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে মামা।

মামাগো আমার আম্মাজান কেমন আছে?

তোমার আম্মাজান ভাল আছে। বিদেশ যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। সেই খবর নিয়ে এসেছি। তোমাদের জন্য অনেক পিঠা দিয়েছে।

রাতে খাবার সময় মামার বাড়ির গল্প জমে ওঠে। ছোটবেলার স্মৃতি, কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি– বর্তমান। জয়নুল মিয়া কখনো চুপ করে থাকে, কখনো বিষণ্ন হয়ে যায়। জয়নুলের অনেক ছোট খলিলুর। জয়নুলের সঙ্গে শালা-দুলাভাইয়ের মধুর সম্পর্ক ছিল। এই বাড়িতে খলিলুর অনেক সময় কাটিয়েছে। জয়নুলের সঙ্গে লেজুড়ের মত লেগে থাকত। সব কথা বলছে ভাগ্নিদের।

বাজানের জন্য কি দিয়েছেন?

ওইতো পিঠাই।

তাহলে আপনি বাজানের কথা বলেন নাই কেন?

পেছন থেকে জয়নুল মিয়া মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে, থাম বকুল। খলিলুর ঘরে আস। খলিলুরকে নিয়ে জয়নুল ঘরে যায়। বকুল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় স্কুল থেকে ফিরছে শিউলি। তার বেশ পেছনে বাকি তিন বোন। শিউলির মাথার ওপর ছাতা। রোদবৃষ্টি না থাকলেও শিউলি ছাতা ব্যবহার করে। এটা ওর এক অভ্যেস। জিজ্ঞেস করলে বলে, ছাতাকে ভালবাসার মানুষ মনে করি। আমাকে সবকিছু থেকে আড়াল করে রাখে।

হিহি ক রে হাসে অন্য বোনেরা। বলে, বোকার মত কথা। ছাতা যদি অত কিছু পারবে, তাহলে মানুষের দরকার কি? ছাতাতো আমার বাজানের মত–

ধমকে ওঠে শিউলি, চুপ কর তোরা। আমার যা খুশি তা করব। তাতে তোদের কি! হারামজাদীদের কেবল কথা।

গালি দেবে না বলে দিলাম!

একশোবার দেব। হারামজাদী। কুত্তা, শুয়োর–

সকলে চুপসে যায়। ভাবে, ওদের বড় বোন কোন কারণে আজ ক্ষিপ্ত। থাক, তার মেজাজ গরম করে লাভ নেই। বোনেরা আবার হিহি করে হেসে শিউলির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমাদের বটগাছ। তোমার নিচে আমরা ছায়ার মত থাকব। তুমি কি আমাদের তাড়িয়ে দেবে? নাকি বেড় দিয়ে আগলে রাখবে?

কিছুই করব না।

কিছু করবে না?

আমিতো জানি তোরা নিজেরাই বটগাছ। নিজ নিজ পথ খুঁজে নিবি। তোরা আমার তোয়াক্কা করবি না।

চার বোন একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, তুমি এমন করে বোলো না বুবু। সত্যি বলছি তুমি আমাদের বটগাছ।

যা ভাগ! ভাগ বলছি।

আবার হাহা হিহি হাসি। হাসি তে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ।

বকুলের এতকিছু ভাবনার মাঝে শিউলি কাছে এসে দাঁড়ায়। ছাতা বন্ধ করে বলে, দূর থেকেই তোকে দেখেছি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস।

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তোমার হাতটা ধরলে ভরসা পাই। দাও, ব্যাগটা আমার হাতে দাও। ছাতা তো দেবে না জানি!

বাজান কই?

ঘরে। খলিলমামা এসেছে।

খলিলমামা? মায়ের শরীর ভালতো?

ভালই আছে। চল, ঘরে চল।

দাঁড়া, ওরা আসুক।

তিন বোন দৌড়তে দৌড়তে আসে।

চম্পা চেঁচিয়ে বলে, বুবু পদ্ম এবারও ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। হাসুবু জিলাপি কিনে এনেছে।

তিন বোন ছুটে ঘরে ঢোকে। পেছনে শিউলি আর বকুল। বকুল শিউলির হাত ধরে রাখে। দু'বোনেই দু'জনের উষ্ণতার জায়গা খুঁজে পায়। ভাবে, এই ভরসা নিয়েই ওদের বেঁচে থাকা। ওদের তো অনেকটা পথ যেতে হবে।

রাতে খাবার সময় মামার বাড়ির গল্প জমে ওঠে। ছোটবেলার স্মৃতি, কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি– বর্তমান। জয়নুল মিয়া কখনো চুপ করে থাকে, কখনো বিষণ্ন হয়ে যায়। জয়নুলের অনেক ছোট খলিলুর। জয়নুলের সঙ্গে শালাদুলাভাই য়ের মধুর সম্পর্ক ছিল। এই বাড়িতে খলিলুর অনেক সময় কাটিয়েছে। জয়নুলের সঙ্গে লেজুড়ের মত লেগে থাকত। সব কথা বলছে ভাগ্নিদের। কেমন করে যেন সময় ওলোট-পালোট হয়ে যায়। ওরা গালগল্পে জমে গেলে প্রবল মন খারাপ হয় জয়নুলের। খলিলুর বাড়িতে থাকলে রাশিদুনের মুখের হাসি ফুরাত না। বলত, আমার ভাইটার তোমাকে কাছে পেলে ফুর্তির সীমা থাকে না! মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওকে এই বাড়িতে রেখে দেই। জয়নুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, রাশিদুনের সব ইচ্ছা চুরমার হয়ে গেছে। এখন খলিল আসে কিন্তু আগের মত আর জয়নুলের সঙ্গে জমে না। আপনজন না, দূরের মানুষ জয়নুল। মেয়েদের মামাকে খাতির করে। খলিলুর তার প্রাণের ছোঁয়া পায় না। সময়টা এমনই ওলোটপা লোট হয়ে গেছে। তারপরও জয়নুল কান পেতে গল্প শোনে। আস্তে আস্তে বুকের ভার নেমে যায়। ভাবে, ভালইতো লাগছে নানা কথা শুনতে।

পরদিন খলিলুরের সঙ্গে বকুল মায়ের কাছে যায়। বকুলের না থাকা সব বোনকে নিঃসঙ্গতার বোধে আক্রান্ত করে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। শিউলি একাই রান্নাঘরে যায়। মামার জন্য ভিন্নকিছু রাঁধতে হবে বলে মাংস রান্না করেছিল। হাঁড়ির ঢাকনা উল্টে দেখে খানিকটুকু তরকারি আছে। ভাবে, এই বেলা রান্না করবে না। শুধু ভাত রাঁধবে। আলু ভর্তা করবে! নিজেকে খুব বিপন্ন বোধ করে শিউলি! কতদূরে যাবে বকুল? যোগাযোগ রাখতে পারবে কি? কতদিন পর বাড়ি আসতে পারবে? পরক্ষণে নিজেকে সামলায়! এসব ভেবে লাভ নেই। অন্য সব বোনের বিয়ে হয়ে গেলে বাবাকে বলবে এই বাড়িটা ওর নামে লিখে দিতে। তারপর ছোটখালার কাছে একটা মেয়ে চাইবে। বড়মামার বড় ছেলেটাকে চাইবে! ওদেরকে এই বাড়িতে এনে পড়ালেখা শেখাবে। বড় হলে কুসুম আর রাজীবের বিয়ে দিয়ে বলবে, এখন থেকে এই বাড়িটা তোদের। আমি তোদের নামে লিখে দেব। তোরা কেউ কাউকে ছাড়বি না। তালাক খুব খারাপ। ছেলেমেয়েদের জীবন শেষ করে দেয়। ওরা আর সুখ খুঁজে পায় না। এই যেমন আমার জীবনে কোন সুখ নাই।

শেষ ভাবনায় এসে শিউলি চোখে আঁচল চাপা দেয়। চম্পা ঢোকে রান্নাঘরে। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তোমার কি হয়েছে বুবু?

বকুল নাই দেখে মন খারাপ লাগছে।

আমারও মন খারাপ লাগছে। আমরা কি একে একে অন্য কোথাও চলে যাব বুবু?

যাবি তো। তোদের শ্বশুরবাড়ি হবে।

তুমি একা এই বাড়িতে থাকবে?

বাজানকে বলব আমার নামে বাড়িটা লিখে দিতে।

কেন?

না হলে অনেক ভাগীদার জুটে যাবে। চাচারা ছাড়বে না।

দুই চাচাইতো ঢাকায় থাকে।

তাতে কি– সম্পত্তির লোভ, বড় লোভ।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তখন সবাই ভাগ বসাতে আসবে।

দেখেছি তো মা চলে যাওয়ার পরও কেউ আমাদের ঠিকমত খোঁজ নেয় না। ঈদেচাঁ দেও বাড়িতে আসে না। মনে করে আমরা তাদের বোঝা।

এসব কথা মনে করিস না। শহরে রিকসা চালিয়ে কয়টাকা আর পায়। আমি মাফ করে দেই। কিন্তু বাড়িটা ভাগাভাগি হোক এটা আমি চাই না। দাদার বড় ছেলে বলে বাবার নামে জায়গাটা ছিল। এখন

প্রত্যেকে বুঝতে পারে আজ প্রত্যেকের কিছু হয়েছে। কেউ আর কোন কথা বলে না। শিউলি অনেকক্ষণ সময় ধরে রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি গোছায়। যেন কাজটা শেষ করা খুব কঠিন। চম্পার মনে হয় কেউ ওকে রান্নাঘরের দরজার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এ বাঁধন ও কোনদিন খুলতে পারবে না। হাস্নুহেনা আর পদ্ম দ্রুত চালগুলো কুলোয় তোলার চেষ্টা করে। পারে না।

আমার নামে হবে। আমি বেঁচে থাকলে বাড়ি আমার নামে হবে। তোরাও চাইতে পারবি না।

তোমার পরে কার নাম হবে?

সেইটা আমরা ভেবে দেখব। বকুলবুবু যদি বাড়িতে দালান উঠায়। তাহলে বকুলবুবুর মেয়ে পাবে।

হ্যাঁ, তা পেতে পারে। নইলে–

শিউলি থেমে যায়। একটু আগেও মামাতোখালা তো ভাইবোনের কথা ভেবেছিল। এখন মনে হয় সে ভাবনা ঠিক হবে না। নিজেদের বোনদের ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হবে।

চম্পা বলে, নইলে বলে তুমি থামলে যে বুবু?

এমনি থামলাম। আমরা সবাই মিলে ভাবব যে আমরা কি করব।

সেই ভাল। কুলোয় করে আমাকে চাল দাও। আমি বেছে দেই।

শিউলি মাটির কলস থেকে চাল বের করে চম্পাকে দেয়। চম্পা রান্নাঘরের কোণায় বসে চাল বাছে। দূরে বয়াতীর গান শোনা যায়। লোকটা যখন গান গায় তখন গলা ছেড়ে গায়। চম্পা মনে মনে ভাবে, গলাতো না, যেন চাঁদের হাসি। এত সুন্দর লাগে! মনে হয় কান পেতেই থাকতে। আজও চম্পা আনমনা হয়ে যায়। কুলোর ওপর হাত থেমে যায়। মরা চাল বেছে ফেলা হয়ে ওঠে না। কাঁকরদানা আ ছে কিনা সেটাও খুঁজে দেখা হয় না। কেবলই গান মরমে বসে– ও আমার দেওয়ানা– কোন বনেতে থাকিস। ফুল ফুটে পাতা ঝরে দেখাতো দিস না– ও আমার দেওয়ানা –

চম্পার আবার মন খারাপ হয়। বাড়ির ওঠোনের কোণায় বাবার কেটে আনা ধানের বোঝা বিশাল এক স্তূপ হয়ে আছে। সামনে অনেক কাজ। ধান মাড়াই হবে, সেদ্ধ হবে, চাতালে যাবে, ধান ভানার মেশিনে উঠবে। এখন সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। শ্বাস টানতে ভাল লাগছে না ওর। ও কুলোর ওপর হাত জড়ো করে চুপচাপ বসে থাকে। শিউলি বাসন-কোসন নিয়ে কলতলায় গেছে। হাস্নুহেনা আর পদ্ম পাশের বাড়ি থেকে ফিরে সরাসরি চম্পার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাকে ভূতের মত লাগছে কেন? হয়েছে কি? চাল বাছতে ভাল লাগছে না? দাও আমাকে।

চম্পা চালের কুলো ছুঁড়ে মারে ওদের দিকে। দু'বোন এক লাফে সরে যায়। কুলো গিয়ে উঠোনের মাঝখানে পড়ে। ছড়িয়ে যায় রান্নার চাল। দু'বোন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে চম্পার দিকে। চম্পা ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃষ্টির আগুন ছড়ায়।

মারামারি করলে আয়।

দু'বোন থিতিয়ে যায়। তারপরও পদ্ম তেজের সঙ্গে বলে, তুমি কি করে ভাবলে যে আমাদের দু'জনের সঙ্গে তুমি একা পারবে?

বেশি বাড়াবাড়ি করবি না পদ্ম।

হাস্নুহেনা ওর হাত ধরে বলে, ঠাণ্ডা হ রে চম্পা। থালাবাসন ধুয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় শিউলি।

তোদের হয়েছে কি?

তিন বোন চুপ করে থাকে। শিউলি চেঁচিয়ে বলে, তোদের জ্বালা আমার আর সইতে ভাল লাগে না। আমি যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব।

যাও না দেখি? পারলে তো যাবে?

কথা বলবি না চম্পা। মাথা গরম করেছিস কেন কে জানে। কুলো নিয়ে আয়। হাস্নু চালগুলো ডালায় করে নিয়ে আয়। ঝেড়ে পরিষ্কার কর। উঠানে চাল পড়ে থাকতে দেখলে বাজান রাগ করবে।

করুক। করলে কি হবে? ভারী তো একটা বাজান!

প্রত্যেকে বুঝতে পারে আজ প্রত্যেকের কিছু হয়েছে। কেউ আর কোন কথা বলে না। শিউলি অনেকক্ষণ সময় ধরে রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি গোছায়। যেন কাজটা শেষ করা খুব কঠিন। চম্পার মনে হয় কেউ ওকে রান্নাঘরের দরজার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এ বাঁধন ও কোনদিন খুলতে পারবে না। হাস্নুহেনা আর পদ্ম দ্রুত চালগুলো কুলোয় তোলার চেষ্টা করে। পারে না। মনে হয় হাত কাজ করতে চাইছে না। দু'জনেই মনে মনে ঠিক করে, বাজান জানতে চাইলে বলবে, কুলোটা হাত থেকে পড়ে গেছে। কাক তাড়াতে গিয়ে এমন হয়েছে। আর কোনদিন কুলোয় চাল নিয়ে কাক তাড়াবে না। পরক্ষণে দু'জনের মনে হয়, বাজানতো একথা কখনোই জিজ্ঞেস করবে না। বলবে, ধুলোবালিভরা এই চাল কুড়াতে হবে না। আমার উঠোনভরা ধান তোরা দেখতে পাস না? দু'জনে ফিক করে হাসে! তখন শিউলির কাজ শেষ হয়। উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চম্পা নিজের আচ্ছন্নতা থেকে বের হয়ে বলে, আজ আমি খিচুড়ি রান্না করব। তোমরা কলাপাতা কেটে আনবে। সময় পাল্টে যায়। স্তব্ধ সময়, কলকল বয়।

দু'দিন পরে বাড়ি ফিরে আসে বকুল।

মা ওকে নানাকিছু দিয়ে ছোট ব্যাগ ভরে দিয়েছে। বলেছে, ব্যাগের দিকে তাকালে তোর অভাগীমায়ের কথা মনে পড়বে। বকুল মায়ের গলা জড়িয়ে বলেছে, মাগো তোমার কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে। তোমার মত কে আর আছে। বোনদের কাছে এইসব গল্প বলার সময় ওরা হেসেছে, কেঁদেছে। ওদের এমনই হয়। কথায় কথায় ওদের অনেককিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। তখন ওরা নিজেদের মধ্যে থাকে না। তালাকপ্রাপ্ত বাবামা য়ের সম্পর্কের সূত্রে আটকা পড়ে। আজও ওরা যার যার কাজে উঠে যাবার সময় পরস্পরের দিকে তাকায়। শিউলি বলে, বাজানকে বলব তোকে একটা স্মৃতির চিহ্ন দিতে।

বাজান আবার শাড়িজুতা কিন তে যাবে তা আমি চাই না। বাজানের হাতে টাকা আছে কিনা কে জানে। এমনিতে আমার জন্য দেনা করতে হয়েছে।

শিউলি বলে, তাহলে বাজানকে বলব তোকে এক বোতল ধান দিতে। বাজানের শ্রমের ধান।

বকুল লাফিয়ে ওঠে।

ঠিক বলেছ। আমি একটা তেলের শিশি ধুয়ে বলব, আমাকে এক বোতল ধান দেন বাজান। ধানের চেয়ে বড় উপহার আর কি হবে!

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে গেটের কাছে থমকে দাঁড়ায় শিউলি। নারী-পুরুষের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বকুলের হাসি বুঝতে অসুবিধা হয় না শিউলির। সঙ্গে সঙ্গে বোঝে সোহেল ছাড়া কেউ না। দু'জনে ধানের গাদার আড়ালে আছে। বাড়িতে আর কেউ নেই।

এখন ও কি করবে? দু'এক পা করে পেছনে সরে আসে। মেহগনি গাছের ছায়ায় বসে থেকে ভাবে, এক জনমে কতকিছুইতো দেখা হবে। এ আর নতুন কি! বকুলের শরীরে আজ থেকে সোহেলের ছায়া দেখা হবে। ও গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

এক সময় দু'জনে ধানের কুটো গা থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে আসে। বাড়ির সামনে শিউলিকে দেখে চমকে উঠে বলে, বুবু তুমি এখানে কেন?

শিউলি স্থির ঠা-া কণ্ঠে বলে, তোদের জন্য।

চমকে ওঠে দু'জনে। সোহেল আস্তে করে বলে, ঘরে চলেন।

শিউলি আস্তে করে বলে, বিদেশ যাওয়ার আগে তোমাদের বিয়ে হতে হবে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

চিত্রকলা

রিয়াজ কোমু

উলেখ এন পি

মুম্বইয়ের চিত্রকর ও ভাস্কর রিয়াজ কোমু ভারতের তরুণ প্রজন্মের সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই তরুণ শিল্পী জটিল বিষয়বস্তু যেমন মৃত্যু এবং মানবজগতের স্থানচ্যুতি থেকে একেবারে তৃণমূলস্তরে ফুটবল খেলা পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ে তাঁর কাজের জন্য উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর চরিত্রের প্রধান আকর্ষণীয় দিকটি হল ব্যক্তিমানসিকতার বিকাশে তিনি অরাজকতার বদলে শৃঙ্খলাবোধকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশৃঙ্খল চিত্ত যেমন অনেক সৃজনশীল প্রতিভার ব্যক্তিস্বাধীনতার সন্ধানে সহায়ক হয়, কোমুর ক্ষেত্রে সেই পরিচালন শক্তি নিঃসন্দেহে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা।

কোমুর জন্ম ১৯৭২-এ কেরালায় এক ব্যবসায়ী পিতা ও ধর্মভীরু মায়ের কোলে। কোমু খুব অল্প বয়সেই তাঁর অদৃষ্টের ইঙ্গিত লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। বাড়িতে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে জীবনের প্রথম পাঠ হিসেবে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শিক্ষালাভ করেন। বাড়ির বাইরে, রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মানবতাবোধ, লিঙ্গ সমস্যা এবং মার্কসবাদ বিষয়ে তাঁর বর্তমানের জ্ঞানের সম্প্রসারণ।

তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট কাজের মধ্যে ২০০৫এ আঁকা *মাই ফাদারস ব্যালকনি*তে ধর্মের প্রতি আস্থাস স্পর্কিত বিষয়গত চিত্রগুলি সর্বোত্তম বলে বিবেচিত। তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি নোয়ার আর্কের আকারে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। প্রথম দৃষ্টিতেই এটি এক অনুপম সৃষ্টি বলে মনে হবে তবে এর সিঁড়িপথে কিছুটা উপরে উঠলেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির স্পষ্ট সম্ভাবনা অনুভূত হবে যে অন্যান্য সংস্কৃতি কিভাবে দেশীয় সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চলেছে।

সিঁড়িপথে ভাস্কর্যের ওপর ওঠার পর চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো বস্তু ও তার কাঠামো থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে শিল্পীর উদ্বেগ, বিশ্বাস, মানুষকে উঠে দাঁড়াতে এবং সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিতে কতখানি কার্যকরী হয়। এ ধরনের ভারসাম্যহীনতা যা আমাদের চারপাশে নানা রূপে বিরাজমান তা শিল্পীর আরো অনেক রচনায় প্রকাশ পেয়েছে যেমন– *থার্ড ডে* (২০০৫) এবং *আন্ডারটেকারস অ্যান্ড আদার* (২০০৭)এ।

যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন তার জন্য তিনি যথেষ্ট গর্বিত। তাঁর এই রাস্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম এবং সংঘাত প্রভাবিত দেশবি দেশের রাজনীতি বিশেষ করে ভৌগোলিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাছাই। কৌতূহলের বিষয় এই বিষয়গুলি নাড়াচাড়ার সময় কোমু এক ধরনের মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কাজ করেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে *সিস্টেমেটিক সিটিজেনস, ব্যালাড অফ দা ডিস্ট্র্যাকটেড ভার্সাস, কাল্ট অফ দা ডেড অ্যান্ড মেমরি লস এবং পেট্রো-অ্যাঞ্জেল* ধরনের কোমুর কাজগুলির সমীক্ষা করা প্রয়োজন। *সিস্টেমেটিক সিটিজেনস*এ কোমু শহরে আসা শ্রমিকদের দুর্দশা এবং *ব্যালাড*-এ শহর বম্বের হতাশাগ্রস্ত 'ঠাঁই নাই' পরিস্থিতি অতি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। *পেট্রো-অ্যাঞ্জেল* ২০০৭ সালে ভেনিস বিয়েনেলএ

ধর্মের প্রতি আস্থার বিষয়টি ছাড়াও কোমুর অন্য একটি প্যাশন হল ফুটবল যা তিনি প্রায় ১২ বছর বয়স পর্যন্তখেলেছেন। এমনকি সেসব মানুষ যাঁরা তাঁর ২০০৭-এ দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ফুটবলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বানকে শুরুতে উপেক্ষা করেছিলেন তাঁরাও ২০০৭-এ ফুটবলের ওপর তাঁর একক প্রদর্শনী সুব্রত টু সিজার দেখার পর মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন।

প্রদর্শিত হয়েছে।

ধর্মের প্রতি আস্থার বিষয়টি ছাড়াও কোমুর অন্য একটি প্যাশন হল ফুটবল যা তিনি প্রায় ১২ বছর বয়স পর্যন্ত খেলেছেন। এমনকি সেসব মানুষ যাঁরা তাঁর ২০০৭এ দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ফুটবলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বানকে শুরুতে উপেক্ষা করেছিলেন তাঁরাও ২০০৭এ ফুটবলের ওপর তাঁর একক প্রদর্শনী *সুব্রত টু সিজার* দেখার পর মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে শিল্পী বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের অনুপস্থিতিতে মানুষের ক্রোধ ও বিরক্তির ছবি তুলে ধরেছেন।

১৯৯১ সালে কেরালা ছেড়ে বম্বের জে জে স্কুল অফ আর্টে চিত্রকলায় শিক্ষাগ্রহণের সময় কোমু ১৯৯২-'৯৩-য়ে যে রক্তাক্ত দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেন তা তাঁর চিত্তে দীর্ঘ ক্ষত সৃষ্টি করে এবং মৃত্যু, তার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে তিনি বিহ্বল বোধ করেন। ১৯৯৮ থেকেই *এ ওয়ার্দি প্রোডাক্ট ড্যামেজড বাই দেয়ার ব্রেইন* থেকে শুরু করে *করাচি সিরিজ* এবং *আভারটেকারস* এবং অন্য অসংখ্য চিত্রে মৃত্যুর ভয়াবহ চেহারার ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর আরো একটি বিষয় হল 'ফাঁদে আটকানো'। ২০০৯এ আঁকা *মিস্টার প্যানপটিকোন* চিত্রে তিনি এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ত্রিস্তরীয় এই চিত্রের পেইন্টিংয়ের মধ্য দিয়ে দিলির তিহার জেলের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছাড়াও কোমুর আরেকটি বিশেষ পারদর্শিতা হল তিনি একজন দক্ষ সংগঠক। ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের চিত্র-প্রশংসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা, বিদেশে বিশ্বকাপ ফুটবলের তারকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের চিত্র তৈরি, গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির আলোচনায় BRICK একটি সাময়িকী প্রকাশ– সবকিছুতেই তিনি দক্ষ সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনিই প্রথম কোচিতে দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি প্যারিসের পম্পিদু সেন্টারে ফরাসি ফুটবলের একটি চিত্র প্রদর্শনীর কাজ করছেন। ক্ষোভ এবং অনুকম্পা প্রদর্শন ছাড়াও সংগঠনের কাজে কোমু অদ্বিতীয়। কোমুর বিষয়ে সত্য ঘটনাটি হল চিত্রকর হিসেবে তিনি সব সময় নিত্যনতুন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুশৃঙ্খল পথে উচ্চ গুণ ও চেতনাসম্পন্ন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় এগিয়ে এসেছেন।

উল্লেখ এন পি ভারতের প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক

সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ**

ঢাকায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সুরসভায় এক বিশেষ মুহূর্তে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী

উৎসব

গানের ভেলায় বেলা অবেলায়

মার্গ সঙ্গীত মহোৎসব বসেছিল ঢাকায় ২০১৩র শেষ ভাগে। এই উৎসব বাংলাদেশের গৌরবমুকু টে নতুন পালক। ভারতের আইটিসি এসআরএর সহায়তায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় আয়োজন ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রথমকে। দর্শকসারিতে নানা প্রজন্মের উপস্থিতিতে প্রতিসরিত হয়েছে সুরের জয়গাথা, রঙ আর ঔজ্জ্বল্য। বিশেষত, তারুণ্যের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস এই আয়োজনের মহার্ঘ প্রাপ্তি। রাতের মৃদু শীত, জাগরণ, রাজনীতির অস্থির পরিস্থিতি আর ঝুঁকি সত্ত্বেও সঙ্গীতের প্রতি মানুষের নিখাদ অনুরাগ চিনিয়েছে নতুন এক বাংলাদেশকে কিংবা বলা যেতে পারে, এটাই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, যা ভুলতে বসেছিলাম আমরা। আইটিসি এসআর-এর সহায়তা আর পৃষ্ঠপোষকদের মহানুভবতাও প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য নয়, আয়োজকদের কল্যাণে কিংবদন্তি শিল্পীদের কেবল সামনাসামনি শোনা নয়, দেখা নয়, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগও মিলেছে। এ উৎসবে এসেছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের উজ্জ্বল নবীন তারকা কৌশিকী চক্রবর্তী দেশিকান। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজেশ্বরী প্রিয়রঞ্জিনী ও চিন্তামন তুষারের মুখোমুখি হন এই বিদুষী।

কেমন আছেন, কেমনইবা লাগছে এই আয়োজন?

সত্যি কথা বলতে কি, এতবড় সংগীত আয়োজনে আসতে পেরে আমি ধন্য। যেখানে বিদুষী গিরিজা দেবীসহ মহাসংগীত ব্যক্তিত্বরা একই স্টেজে পারফর্ম করবেন, একজন শিল্পী হিসেবে আমার কাছে এ যেন এক পরম পাওয়া, স্বপ্নের মতই।

জানতে চাই আপনার পারিবারিক পরম্পরার কথা।

আসলে আমার বেড়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে 'সুর' জড়িয়ে রয়েছে। বাবা পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। সুরের ইন্দ্রজাল আমাকেও আচ্ছন্ন করেছে। তাই খুব ছোটবেলা থেকে সংগীতই ছিল আমার আরাধনা, স্বপ্ন ও বাস্তবতা। বাবা পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীকে দেখেছি সংগীত সাধনার নিরবচ্ছিন্ন সাধক হিসেবে। যে কোন শিল্পীর জন্যেই এ ধরনের জার্নি দেখতে পারা সৌভাগ্যের। আমার জন্যেও এমন বাবার সন্তান হওয়া সত্যিই ভাগ্যের। সে সঙ্গে এ কথাও সত্যি, প্রতিটি শিল্পীর জীবনের সাধনা ও জার্নি নিজস্ব বোধ এবং চর্চায় সমৃদ্ধ হয়। আমার মনে হয়, সাধনা ও যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোন পরম্পরাই রক্ষা হয় না। পরম্পরাকে আমি সৌভাগ্যপ্রসূত বলব, কিন্তু একই সঙ্গে বলব, পরম্পরাকে রক্ষা করতে হলে আরাধনা ও সৃজনশীলতা থাকতেই হবে। একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, পরম্পরা যেখানে থাকবে, সেখানেই কিন্তু জার্নিটা বেশি স্পর্শকাতর ও তীক্ষ্ণ হয়। পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহ্যগত এবং সৃজনশীলতার এক অদ্ভুত ভারসাম্য, দায়িত্ববোধ ও স্বকীয়তার প্রসঙ্গটা জরুরি হয়ে ওঠে। পরম্পরা রক্ষার দায়িত্বটা কঠিন ও সৃজনশীল। পূর্বপুরুষের খ্যাতি যাঁরাই বহন করতে পেরেছেন তাঁদের কঠিন সাধনা, যোগ্যতা অর্জন ও স্বকীয় সৃজনশীলতা প্রমাণ করে সেটি রক্ষা করতে হয়েছে।

আপনার ক্যারিয়ারগ্রাফের উচ্চতা ভিন্নধারার। ১৯৮০ সালে আপনার জন্ম, ইতোমধ্যেই অর্জন করেছেন অজস্র অ্যাওয়ার্ড, সাফল্য ও খ্যাতি। একজন নারী হিসেবে জানতে চাচ্ছি জার্নিটা কেমন অথবা নারীদের জন্যে জার্নিটার অভিজ্ঞতা কেমন বলে মনে করেন?

মা দুর্গার দশভুজা রূপে যে অপার শক্তি, এটি কিন্তু নারীদের জীবনে ভীষণভাবে প্রতিফলিত। একজন নারীর বহু সত্তা। যদি তিনি শিল্পী হন সেই দায়িত্বভার আরো বেশি তীব্র, স্পর্শকাতর, তীক্ষ্ণ। নারীর নিজের কাজ, নিজের সাধনা ছাড়াও তাকে সবকিছুই রক্ষা করতে হয়, দায়িত্বশীল হতে হয়। কন্যা, মা, স্ত্রী, স্বকীয়-সত্তা– সব মিলে এক মহাদায়িত্বের যজ্ঞ! একজন শিল্পী হিসেবে বলব, সাধনা ও সংগীতযাত্রার মধ্যেই সংসার সামলানো, সন্তানের দেখভাল, সবকিছুই করতে হয়। একজন পুরুষ শিল্পী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার সাধনার মগ্নতা নিয়ে ফোকাসড থাকতে পারেন। হয়তো অনুষ্ঠান থাকল, রাত করে ফিরলেন, তার জন্যে বাড়িতে খাবার ও অন্য সবকিছুই রেডি থাকে। পুরুষরা কিন্তু একটু বেশিই প্রিভিলেজড। সে ক্ষেত্রে একজন নারীকে তার শিল্পীসত্তা অথবা অন্য যে কোন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হয়। ফুলটাইম ফোকাসড হতে হয়। তবে নারীদের অন্তর্শক্তি বা ইনার পাওয়ার মারাত্মক। নারীদের ভার্সেটাইলিটি অসীম। এই গুণের জন্যে নারীরা এগিয়েছেন এবং জার্নিটা সচল রাখতে পেরেছেন। নারীদের লড়াইটা বহুমুখী ও নিরন্তর। আমার কথা হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই নারীরা নানা চালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং উত্তীর্ণও হচ্ছেন। নারীর নিজস্ব যোগ্যতা প্রমাণ করেই অর্জন করে নিতে হয় নিজের স্থান। নারীসত্তা এক পরম শক্তি।

তা হলে তো নারী শিল্পী হিসেবে উচ্চাঙ্গসংগীত চর্চা করা বিশেষভাবে শক্ত। এতে তো অনেক সময় আর মনোসংযোগের প্রয়োজন হয়।

মেয়ে হিসেবে আমাদের সমাজে অনেক কিছুই করা শক্ত। শুধু গান কেন? গান তো বরং ভাল। খারাপ ভাববেন না। গান মাঝেমধ্যে করা তো ভাল। কারণ হিসেবে বলতে হয়, মেয়ে দেখতে এসে বরপক্ষের যেসব প্রশ্ন শুনতে হয়। যেমন রান্না করতে পারে কিনা, চুল বাঁধতে পারে কিনা, গান গাইতে পারে কিনা? এদিক থেকে মেয়েদের গান শেখাটা সমাজে উৎসাহিতই করা হয় কিন্তু শিল্পী হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্যে করলে তা আবার ভাল না। আবার আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে রান্না করাও তো মেয়েদের জন্যে ভাল নয়। কারণ বিশ্বে যত নামকরা শেফ রয়েছেন

আজকে যে রাস্তায় আমরা চলি, সে রাস্তা তাঁরা তৈরি করেছেন। ওই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা আজ হয়েছেন পারভিনজি, কিশোরী আমানকর, মালিনী রাজুরকর। এমন অনেক নাম রয়েছে যাঁরা অনেক সহ্য করেছেন। ফলে সামাজিক বিন্যাসের কোথাও এর একটা গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও তৈরি হয়েছে। এখন নারী ও পুরুষ একই মঞ্চে কাজ করতে পারেন। কিন্তু ওই পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যেও রয়েছে জীবন সংগ্রাম।

তাদের সবাই পুরুষ। অথচ বাড়িতে কিন্তু কোন পুরুষ রান্না করেন না। বাড়িতে তো রাঁধুনি আছেই। তাই আত্মপরিচয়ের জন্য নারীর পক্ষে অনেক কাজ করাই কঠিন।

কিন্তু একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর মেয়ে হিসেবে কি বিষয়টা একটু আলাদা নয়?

পেশা ও সমাজ এমন বিষয়, সেখানে শিল্পীর মেয়ে আর একজন সাধারণের মেয়ে– সবারই এক দশা। কারণ দর্শক, সমাজ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি আমাকেই হতে হয়। আর মঞ্চে কিন্তু সবাই একা। মঞ্চে কেউ কারো নয়। আপনি যখন সমাজ ও সমাজের মানসিকতার মুখোমুখি হবেন তখন কিন্তু আপনি একা, খুবই একা। কারো ছেলে কিংবা মেয়ে হোন অথবা ভাই বা বোন যা-ই হোন না কেন– এর জন্যে কোন ছাড় পাবেন না আপনি। কাজেই মানসিকতা হিসেব করে মেয়েদের জন্যে পেশা হিসেবে কোন কিছুকে নেওয়া অনেক কঠিন। তার সব থেকে বড় প্রমাণ ভারতবর্ষেই আছে। গানের স্কুলে যে কোন একজন শিক্ষকের কাছে তিনটি ছেলের সঙ্গে তিনশো মেয়ে শেখে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে ক'জন ছেলে আর ক'জন মেয়ে গান করে। এর অনুপাত মেলাতে গিয়ে দেখবেন ফলাফল একেবারেই উল্টো। তাহলে এই তিনশো মেয়ে যায় কোথায়? তারা যে গান শিখতে গেল, আসল প-াটফর্মে গিয়ে তিনজনও বাঁচে না কেন? আসলে মাঝখানে যা হয়, তা সবাই সহ্য করতে পারে না। সেগুলোকে পেরিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা থাকে, সহজাত প্রতিভা থাকে, যোগ্যতা থাকে, সব থাকে। ভাল গুরুর কাছে শিখতে যায়, শিক্ষা হয়। সবই থাকে কিন্তু তারপরও হয় না! আমার বাবা গান করছেন, আমি গান করছি কিন্তু আমার মা গান করেননি। তাই বলে কেউ যদি ভাবে, আমার মায়ের যথেষ্ট প্রতিভা ছিল না তাও কিন্তু নয়। তিনি করতে পারেননি! কাজেই এ রকম উদাহরণ আমার বাড়িতেই আছে। বাইরে কেন যাব? কাজেই এটা সব সময়ই কঠিন। এ ধরনের জগতে, এ ধরনের সামাজিক মানসিকতার সঙ্গে অনেকভাবে যুদ্ধ করতে হয়। সেটা তো সবাই করতে পারে না। তাই সহজাত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও হয়তো পেশাদারি মঞ্চে পৌঁছনো শক্ত হয়। তবে বিদুষী গিরিজা দেবী বা তাঁর মত অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা এটাকে সম্ভব করেছেন। তাঁদের প্রজন্মে অবস্থা কেমন ছিল, ভাবুন তো। আজ আমি যদি বলি এটা কঠিন, তা হলে আরো তিন প্রজন্ম আগে কী রকম অবস্থা ছিল? তাঁরা আমাদের কাছে প্রেরণাদায়ক, তাঁরা আমাদের সাহস, শক্তি। আজকে যে রাস্তায় আমরা চলি, সে রাস্তা তাঁরা তৈরি করেছেন। ওই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা আজ হয়েছেন পারভিনজি, কিশোরী আমনকর, মালিনী রাজুরকর। এমন অনেক নাম রয়েছে যাঁরা অনেক সহ্য করেছেন। ফলে সামাজিক বিন্যাসের কোথাও এর একটা গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও তৈরি হয়েছে। এখন নারী ও পুরুষ একই মঞ্চে কাজ করতে পারেন। কিন্তু ওই পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যেও রয়েছে জীবন সংগ্রাম। সেটা আমার মনে হয় এখনো পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশি। এখনো একজন পুরুষ শিল্পী কাজ শেষে বাসায় এসে বিশ্রাম করেন, তার জন্যে খাবারও প্রস্তুত থাকে। একজন নারী শিল্পী কিন্তু এখনো তেমন ব্যবহার পান না। এই মৌলিক পার্থক্য থাকবে। এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যে আমি অভিযোগ তুলব, নাকি আমার সড়্গামতা হিসেবে ধরব? নাকি আমরা এটাকে মেয়েদের মৌলিক যোগ্যতা হিসেবে নেব, মেয়েরা একই সঙ্গে অনেক কাজের কাজি। নিজের ওপর নির্ভর করছে।

ব্যক্তি কৌশিকীর কথা জানতে চাচ্ছি।

আমি, আমার সংসার, জীবনসঙ্গী পার্থসারথী দেশিকান, সেও একজন শিল্পী। আমাদের চার বছরের ছেলে ঋষিথ! আমার শৈশব কেটেছে কলকাতায়। পাঠভবন স্কুলে পড়েছি, এরপর যোগমায়া দেবী কলেজ, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে মাস্টার্স শেষ করি। কিন্তু আমার জীবনে দু'টি সত্তা। একজন ব্যক্তি কৌশিকী, অন্যজন ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার কৌশিকী। ব্যক্তি কৌশিকী বন্ধুবৎসল, আমুদে, ফটোগ্রাফি করতে ভালবাসে। প্যারাগাইডিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার দারুণ রোমাঞ্চিত করে। সব ধরনের গান শুনতে ভালবাসি। নানা পেশার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিতে ভাল লাগে। এই সত্তার সঙ্গে শিল্পী কৌশিকীর কোন বিরোধ নেই।

একজন সফল সংগীতশিল্পী হিসেবে আপনার গানের প্রতি দর্শক-শ্রোতার যে সংযোগ– সেখানে কিন্তু আপনার সিগনেচার স্টাইল নিয়েও আগ্রহ

পিতাপুত্রীর অভিনব যুগলবন্দী

আছে, ভাললাগা আছে– শেয়ার করবেন কি?

তাই বুঝি? আমি সাজতে ভালবাসি, তবে খুবই নিজের মত। গানের সময় শাড়ি, অন্য সময় সালোয়ার-কুর্তা আর ট্র্যাভেল বা কাজের সময় ওয়েস্টার্ন আউট-ফিটস। এটা অনেকটা কাজ ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। বোধেরও বিষয় আছে। সময় ও মুহূর্ত আছে। পেপসি অর্থাৎ সব্যসাচীর ডিজাইন আমার খুব পছন্দ। এছাড়া কাঁথা স্টিচ, ট্র্যাডিশনাল ডিজাইন খুব ভাল লাগে। গহনা ভাল লাগে, সোনা পরা হয়, তবে দুর্বলতা রূপার গহনায়। সাজের সঙ্গে বোধ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের বিষয় আছে।

আপনার বাবা পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী! এমন দিকপাল ব্যক্তিত্বের সন্তান আপনি। কী বলবেন?

বাবা শুধু সার্থক শিল্পীই নন, বাবা জীবনের এক বর্ণাঢ্য 'আইকন'। ভ্যালুজ, আরাধনা, সুন্দর জীবনযাপন, জীবনকে দেখার দর্শন, পরিমিতি বোধ– এ সবই বাবার মধ্যে অদ্ভুতভাবে বিরাজমান। শ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার মত 'সংগীত' তো বাবার কাছ থেকেই শিখেছি। কনফিডেন্স ও ফ্রিডম... বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। বাবা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব!

আপনার প্রিয় রাগ কী?

সত্যি বলতে কি, সব রাগই নির্ভর করে সময় ও ইচ্ছের ওপর। অনেক সময় কিছু কিছু রাগ ভাল লাগত না। বাবা বলতেন, 'ভাল করে জানিস না, তাই বলিস ভাল লাগে না'। ভাল করে শেখ, গভীরে অনুভব কর, দেখবি ভাল লাগবে। সত্যি পরবর্তী সময়ে দেখেছি রাগের অতলে ডুব দিলে সত্যিই সুরের অরূপ রতন মেলে!

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। অকালপ্রয়াত চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ আপনাকে দিয়ে প্রমিন্যান্ট রোলে অভিনয় করাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর শেষ ছবি *চিত্রাঙ্গদায়* দেখা গেছে আপনাকে! একটু বলবেন কি?

ঋতুদার খুবই ইচ্ছে ছিল আমাকে দিয়ে একটি প্রধান চরিত্র করানোর। যেমন অপর্ণা সেনকে নিয়ে *১৯ এপ্রিল* করেছিলেন। আসলে আমিই নিজেকে সেভাবে ভাবতে পারিনি। *চিত্রাঙ্গদায়* আমি যে গানটা করেছিলাম, শুধু গানটার জন্যেই আমাকে সেভাবে দেখা গেছে আর সেটাও ছিল ঋতুদার আবদার। ভাবতেই পারি না ঋতুদা আকাশের তারা হয়ে গেছেন।

আপনার তারকাখ্যাতি গগনচুম্বী, এ সময়ের সেলিব্রিটি আইকন আপনি। আপনার নামের আগে বিদুষী বিশেষণ যোগ করেন বিদগ্ধজনেরা। কীভাবে বিশেষণ করবেন?

সত্যি বলতে, তারকা বলে নিজেকে ভাবি না। আমার মনে হয় কয়েকটা জন্ম গেলেও আমি বেগম আখতার, বিদুষী গিরিজা দেবী, পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা ওস্তাদ জাকির হোসেনের মত তারকা হতে পারব না। আমি শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রেমিক! সুরের সাধনা করার চেষ্টা করছি। এর বাইরে খুব সাধারণ মেয়ে, বন্ধুদের বন্ধু, ঋষিথের মা, ভাইদের বোন, মা-বাবার মেয়ে, এই তো– এ সব নিয়েই কৌশিকী আমি।

সূত্র **চারবেলা চারদিক**

ছোটগল্প

রাবেয়া

শাহনাজ নাসরীন

রিকশাওয়ালাকে বিহারী পলীর দিকে যেতে বলে আকাশ-পাতাল ভাবে অরা। হাতে তেমন সময় নেই। অথচ অনেক কেনাকাটা গোছগাছ বাকি। শুধু তো তার নয়, বাচ্চা দু'টিরও শীতের কাপড়-চোপড় নিতে হবে বেশি করে। বঙ্গবাজারে যেতে হবে কয়েকদিন। একদিন গিয়েছিল, তো শুধু ওর নিজের আর বাচ্চাদের জন্য কয়েকটি জিন্সের প্যান্ট কিনেছে। শীতের কাপড় কেনা হয়নি এখনও। বঙ্গবাজার থেকে একদিনে কেনাকাটা করা মুশকিল। বেশিরভাগ ব্যবসায়ী সিজনাল ব্যবসা করে। এই গরমে পছন্দসই শীতের পোশাক খুঁজে পেতে, দামাদামি করে কিনতে যে সময় লাগে সে সময়টুকু ঐ বদ্ধ মার্কেটে একটানা কাটাতে হলে মাথা ঠিক থাকে না। ওর বর যখন জার্মানিতে স্কলারশিপটা পেল তখন ওর খুব আগ্রহ ছিল দেশের বাইরে যাওয়ার। কিন্তু মামুন তখন কিছুতেই রাজি হয়নি ওকে নিয়ে যেতে। ওখানে ক'টা বছর থেকে টাকা-পয়সা রোজগার করে দেশে এসে গুছিয়ে বসবে– এটাই ছিল ওর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু ওখানে যাওয়ার চার মাসের মাথায় সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। কেন এখন অরাকে নেওয়ার জন্য এত তাড়া তা ভেঙে বলছে না। তবে মামুন এতটাই বৈষয়িক যে অরা নিশ্চিত, নিয়ে যাওয়াটা আরো বেশি লাভজনক।

কিন্তু এখন অরার একেবারে যেতে ইচ্ছে করছে না। এর মধ্যেই স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়েছে খানিকটা। যদিও পাহারা দেয়ার কাজটি এখন তার বাবা করছেন আর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আনাগোনাও যথেষ্ট। তবু মামুনের জন্য সার্বক্ষণিক অ্যাটেনশন থাকার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর অরার কবিতা লেখা নিয়ে মামুনের একটা তাচ্ছিল্য আছে, এখন ওটার মুখোমুখি হতে হয় না। তাছাড়া ও এখন ফটোগ্রাফির একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছে। প্রায়ই দল বেঁধে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন গ্রামে চলে যায়। মামুন থাকলে সহজ হত না এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া। হাজারো অজুহাত তুলত সে।

অরা মন খারাপ করে ভাবে, তবুও এখন যেতেই হবে কয়েক বছরের জন্য। যেহেতু মামুন চেয়েছে।

দুই.

আচ্ছা, রাবেয়াকে দেখেছেন? রিকশায় বসে বসেই জিজ্ঞেস করে, রাবেয়ার ঘরের সামনে বসা এক মহিলাকে।

না, এখন হ্যার দেখা পাওয়া বহুত কঠিন আছে।

কেন? কোথায় গেছে?

মহিলা ফোঁড় দিতে দিতে রহস্যময়ভাবে বলে, হেইডা কি আর ঠিকঠাক জানা আছে... যায় আয় থাহে থাহে না...

ওকে সেলাই দিয়েছিলাম কিছু, আমার আরো আগেই আসার কথা ছিল– আসতে পারিনি, ও কারো কাছে সেলাইগুলো দিয়ে গেল কিনা বলতে পারবেন?

কই না, দিলে তো ধরেন আমাগোরেই দেয়। ওরে তো সেলাই করতে দেহি না অহন। সে আবার রহস্য করে বলে অর সেলাই করনের দরকারই কী, অহন কপাল খুলিছে...

রাবেয়াকে দিয়ে অরা আগেও কিছু সেলাই করিয়েছে। ওর সঙ্গে কথাটথাও হয় বেশ, কিন্তু এখন দেখল মেয়েটির সম্পর্কে তেমন কিছুই ও জানে না। প্রথমেই তার যে কথাটি মনে হয় তা হল কাপড়গুলো নিয়ে মেয়েটি চলে যায়নি তো! ও বিহারি না, পুরোপুরিভাবে ক্যাম্পের বাসিন্দাও না এটা জানে, কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে কীভাবে কোথায় খুঁজবে ওকে ভেবে নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগে ওর। আগে এ কথাগুলো মনে হয়নি কেন ভেবে আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে।

মহিলাকে আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে না। এমন মেকি ভাবভঙ্গি! কথা বলার প্রবল ইচ্ছার ওপর অনিচ্ছার একটা প্রলেপ দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে রেখেছে। ও ইতস্তত করতে থাকে। এখানে অপেক্ষা করাও সম্ভব না আবার ফিরে গেলে কবে আসতে পারবে বা এলেও রাবেয়াকে পাওয়া যাবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না।

অরার আত্মবিশ্বাস তলানিতে পৌঁছনোর আগেই অবশ্য রাবেয়াকে দেখা যায় রাস্তার শেষ মাথায়। কাছে এলে ও তাড়া দেয়, অনেকক্ষণ বসে আছি তোমার জন্য। সেলাইগুলো কারো কাছে দিয়ে গেলেই তো পারতে। টাকাপয়সা তো আগেই দেওয়া ছিল।

রাবেয়া চুপ করে থাকে। নড়াচড়া নেই, কাপড়গুলো নিয়ে আসার তাড়া নেই। অরা একটু অসহিষ্ণু হয়ে আবারো তাড়া দেয়, একটু রেগেও যায়... কী হল তোমার, কথা বলছ না যে? আগামী মাসের ১৮ তারিখে আমি বিদেশে চলে যাব।

রাবেয়া তাকায় না ওর দিকে। মনোযোগ দিয়ে নখ কাটে দাঁতে আর থেমে থেমে বলে, কাপড়গুলার কাজ শেষ করতে পারি নাই আপা। আরেকটু সময় দেন, হইয়া যাইব।

অরা হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর একই উষ্মা নিয়ে বলে, আমার তো আরো আগেই কাপড় নিতে আসার কথা ছিল, তাই না? সময়ও যথেষ্টই দিয়েছি। কেন হয়নি? তারপর শুনতে থাকে, এখন তো আর পঁচিশ দিনও নেই হাতে। এখন কী করে শেষ করবে?

রাবেয়া তবু চুপ করে থাকে। অরার ক্রমাগত প্রশ্নের কোন উত্তরই সে করে না। ওর গোঁয়ার্তুমি অরাকে আরো অসহিষ্ণু করে, অসুন্দর করে। ও এবার তীব্র শেষের সনাতন পথটি বেছে নেয়। ওহ, সবাই বলছিল তোমার কপাল খুলেছে, এখন নাকি আর কাজ করার দরকার নেই, তাই দেখছি!

রাবেয়া চমকে তাকায় অরার দিকে, তারপর ছুটে ভেতরে গিয়ে

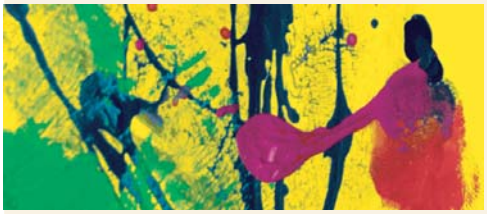

রিকশা চলতে শুরু করলে অরার চোখ গড়িয়ে জল ঝরতে থাকে। কী পছন্দই করত সে মেয়েটাকে! অল্প পরিচয়েই খুব টেনেছিল। সিনসিয়ারিটি ওকে দুর্বল করে, মেয়েটার এই গুণটা ছিল। কাজগুলো করত যত্ন করে। সুন্দর চেহারাটায় সব সময় বিষণ্নতা লেগে থাকত। একটা বাচ্চা আছে বলেছিল। গ্রামে দাদীর কাছে থাকে। টাকা নয়, আজ ওর সিনসিয়ারিটির অভাবটাই অরাকে আঘাত করেছে বেশি।

বাড়ি তালা দিয়ে মালপত্র নিয়ে তার মা'র বাড়ি চলে যাবে। সকালে ওখান থেকেই রওনা হবে। তার ভাই সজীবের বিকেল নাগাদ চলে আসার কথা গাড়ি নিয়ে অথচ সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। অরা বিরক্ত হয়, কেন এত কেলাস সবাই, এত দেরি করছে বাচ্চাগুলোর খিদে পেয়ে যাবে! কলিং বেল বাজে ঠিক এ সময়টিতে। সজীব এসেছে নিশ্চিত ধরে নিয়ে, কিছুই জিজ্ঞেস না করে, কী-হোলে চোখ না ফেলে দরজা খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাবেয়া!

কাপড়গুলো নিয়ে আসে। অরা কড়াভাবে বলে আর এডভান্সের টাকাগুলো?

খরচ হইয়া গেছে, আস্তে আস্তেদিয়া দিমু।

তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে আমি এখানে ঘোরাঘুরি করব?

রাবেয়া কোমরের গিট খুলে কিছু দোমড়ানো-মোচড়ানো দশ টাকার নোট বের করে। বলে, এগুলোই আছে। বাকিটা আমি বাড়ি গিয়া দিয়া আসমু।

ওর স্পর্ধা দেখে অরার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। দেখে আশপাশে এরই মধ্যে তামাশা দেখার লোক জমে গিয়েছে। ও মেজাজ খারাপ করে বের হয়ে আসে।

তিন.

রিকশা চলতে শুরু করলে অরার চোখ গড়িয়ে জল ঝরতে থাকে। কী পছন্দই করত সে মেয়েটাকে! অল্প পরিচয়েই খুব টেনেছিল। সিনসিয়ারিটি ওকে দুর্বল করে, মেয়েটার এই গুণটা ছিল। কাজগুলো করত যত্ন করে। সুন্দর চেহারাটায় সব সময় বিষণ্নতা লেগে থাকত। একটা বাচ্চা আছে বলেছিল। গ্রামে দাদীর কাছে থাকে। টাকা নয়, আজ ওর সিনসিয়ারিটির অভাবটাই অরাকে আঘাত করেছে বেশি। ওর ভেতর তোলপাড় করে একটা প্রশ্নই উঠে আসে, রাবেয়া এমন করল কেন?

বাড়ি ফিরেও রাবেয়া বার বার ঘুরেফিরে আসে ওর মাথায়। সে অপরাধ করেছে তার কাছে। এছাড়া ওর প্রতিবেশীও খারাপ ইঙ্গিত করে কথা বলল কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কোন অপরাধবোধ নেই। উল্টো অরার শেষের প্রতিবাদ করল! বস্তিবাসী হিসেবে মেয়েটি বেশ ব্যতিক্রম ছিল। কোমল, পরিমিত মিষ্টি একটা মেয়ে।

এবার সে সুস্থিরভাবে ভাবতে চেষ্টা করে, কী হতে পারে। আজো ওর চেহারায় ইনোসেন্স দেখেছি আমি, নিজেকে বলে সে, কী হল ওর জানা দরকার, কিন্তু কখন জানব, কাল টাঙ্গাইল যাব ছবি তুলতে।

চার.

দেখতে দেখতে সত্যিই চলে এল উড়ানের দিন। পরদিন সকালে ফ্লাইট। ভোর রাতেই এয়ারপোর্টে চলে যেতে হবে। তাই আজ আর বাড়িতে রান্না হয়নি। বাড়ি তালা দিয়ে মালপত্র নিয়ে তার মা'র বাড়ি চলে যাবে। সকালে ওখান থেকেই রওনা হবে। তার ভাই সজীবের বিকেল নাগাদ চলে আসার কথা গাড়ি নিয়ে অথচ সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। অরা বিরক্ত হয়, কেন এত ক্যালাস সবাই, এত দেরি করছে বাচ্চাগুলোর খিদে পেয়ে যাবে! কলিং বেল বাজে ঠিক এ সময়টিতে। সজীব এসেছে নিশ্চিত ধরে নিয়ে, কিছুই জিজ্ঞেস না করে, কী-হোলে চোখ না ফেলে দরজা খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাবেয়া! একই সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ঢেউ তোলে। ও এখন কেন এল, কোত্থেকে এল... কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে চেয়েই থাকে চুপচাপ।

রাবেয়াও বিব্রত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে, ভাল আছেন আপা? আলভি কই?

অরা একটার পর একটা প্রশ্ন করতেই থাকে রাবেয়ার উত্তরের অপেক্ষা না করেই, তুমি?... কী ব্যাপার?... এখন?... এস ঘরে এস।

কালকে তো আপনে চইল্যা যাইবেন, তাই আসলাম। ...আগেই আসতে চাইছিলাম... আপনের সনে অপরাধ করছি।

অরার মনটা এখন এমনিতেই নরম হয়ে আছে। ওকে দেখে আর ওর কথা শুনে আরো দুর্বল লাগে। বলে, আমিও বুঝতে পেরেছিলাম তুমি রাগ করে আসছ না। আমি ওইদিন রাগারাগি করে এলাম, ভেবেছিলাম যাব একবার। কিন্তু আর সময় করতে পারিনি, বুঝলে। তো আমি যে কালকেই যাচ্ছি, কার কাছে শুনলে?

পরশু আইছিলাম আপা। তো নিচে জিগাইছিলাম। আপনে ছিলেন না। না আপা আপনে আর কী রাগ করলেন। দোষ করছি, রাগ তো করবেনই। আমি রাগ করি নাই আপা। কিছুই মনে করি নাই। আমার উপায় ছিল না। নাইলে পরের দিনই আসতাম। একটু থিত হইতে পারলে আপনের কাপড়গুলাও যেমনেই হউক রাইতদিন জাইগ্যা কইরা দিতাম। আমার কোন উপায় ছিল না গো আপা।

রাবেয়া বোসো, বসে কথা বল। বাড়িতে খাবার কিছু নেই বলে ওর খারাপ লাগে, রাবেয়া নিশ্চয় ক্ষুধার্ত।

শোনো রাবেয়া, আমি বুঝতে পেরেছি কিছু হয়েছে তোমার। আমি তো তোমাকে কী হয়েছে জিজ্ঞেসও করলাম, কিন্তু তুমি বললে না। এখন কী বলা যায় আমাকে?

কইতে চাই আপা কিন্তু এত কথা কইথেকা শুরূ করি দিশা পাই না।

যদিও প্রচ- ব্যস্ততা, টেনশন তবু ওইদিনের অন্যায় আচরণটির প্রতিকার করতে অরা ওকে উৎসাহ দেয় সমস্যাটি জানাতে। সে ওইদিনই ঠিক করেছিল রাবেয়ার সঙ্গে কথা বলবে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চায় না ও। যে খটকাটি ভেতরে রয়ে গিয়েছিল, তা না মেটা পর্যন্ত ও শান্তি পাবে না জানে। রাবেয়া কী একটা দ্বিধায় ভুগছে, তবুও অরা তাড়া দেয় আবার, বল রাবেয়া, আমি আবার মা'র বাসায় চলে যাব রাতে।

রাবেয়া একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাকিয়ে থাকে আলভির দিকে, তারপর বলতে শুরু করে। বেশ গুছিয়ে কথা বলে মেয়েটি কিন্তু এখন এলোমেলোভাবে হাহাকার করে ওঠে, আপা আমার পোলাটার এক বছর হইল আইজ। বুকটা খালি খালি লাগে গো আপা। আলভিকে বুকে চেপে কাঁদে ও।

পাঁচ.

রাবেয়ার তখন চৌদ্দ বছর বয়স। বাবা গরিব কৃষক। অল্প জমিতে চাষ দিয়ে সারা বছরের খোরাকি টেনেটুনে হয়। কিন্তু অন্যান্য খরচ জোগাতে অন্যের জমিও বর্গা নিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেন। অভিশাপের মত পরপর তিনটি মেয়ে। তাই চাষে হাত লাগানোর জন্য বাইরের লোককে কামলা খাটাতে হয়। ফলে লাভ কমই থাকে হাতে। তবে সে বছর তিনি

রাবেয়া মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজ করে, সুন্দর করে ঘর গোছায়, পাখা সেলাই করে, কাপড়ে নকশি তোলে। সবাই বলে রাবেয়াটা খুব কাজের, খালি গায়ের রংটা যদি এত ময়লা না হইত! তাদের কথার মধ্যে অনেক আফসোস, অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। রাবেয়াও 'ইস রংটা যদি আরেকটু পরিষ্কার হইত'– এই মনঃকষ্ট নিয়ে বড় হতে থাকে। তাই সাড়ে চোদ্দতে পরিষ্কার গায়ের রঙের লিটনের প্রেমে মজতে তার দেরি হয় না।

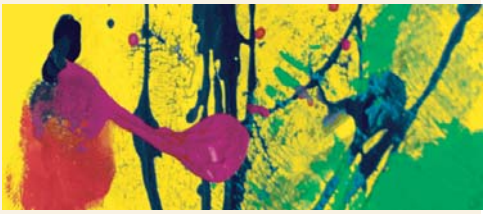

একটি এতিম ছেলে পেয়েছেন কামলা হিসেবে। লিটনের ষোলোস তেরো বছর বয়স। দেখতে সুন্দর। বক সাদা গায়ের রং। বেশ পরিশ্রমী। সারাদিন কাজ করে আর সারারাত বাঁশি বাজায়। ছেলেটি কোত্থেকে এসেছে ভাল করে বলে না। বলে কোথাও কেউ নেই তার। আদাড়েবাদা ড়ে বড় হয়েছে।

রাবেয়া মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজ করে, সুন্দর করে ঘর গোছায়, পাখা সেলাই করে, কাপড়ে নকশি তোলে। সবাই বলে রাবেয়াটা খুব কাজের, খালি গায়ের রংটা যদি এত ময়লা না হইত! তাদের কথার মধ্যে অনেক আফসোস, অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। রাবেয়াও 'ইস রংটা যদি আরেকটু পরিষ্কার হইত'– এই মনঃকষ্ট নিয়ে বড় হতে থাকে। তাই সাড়ে চোদ্দতে পরিষ্কার গায়ের রঙের লিটনের প্রেমে মজতে তার দেরি হয় না। মেয়ের সেই উথালপাথাল প্রেম মায়ের চোখে পড়তেও দেরি হয় না। এদিকে পরিশ্রমী অনাথ কামলাকে তাড়িয়ে দেয়ার সামর্থ্যও তার বাপের নেই আবার এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়াও যায় না। ফলে মেয়ের ওপর নেমে আসে শাসনের খড়গ। আর ভেতরে ভেতরে বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পাহারা দিয়েই বা কতক্ষণ রাখা যায়! এত বাধার পরও তারা ভেসে যেতে থাকে প্রেমের বন্যায়। আর বেশি বেশি পাহারা দিতে গিয়ে ক্ষতির ক্ষতি যা হল তা হচ্ছে পাড়াপড়শী তাড়াতাড়ি জেনে গেল। ফলে ভাল পাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা গেল, অপেক্ষা করার উপায়ও থাকল না।

ষোলো বছর হওয়ার আগেই একদিন বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল আরেক হাভাতে কৃষকের সঙ্গে। সে লোক হাতেও মারে, ভাতেও মারে। যৌতুকের জন্য মারে, ভাতের অভাবে মারে, কালো বলে মারে, সন্দেহ করে মারে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তার হাত চলছেই। এর মধ্যে লিটন বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে। এতে স্বামী একেবারে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাই যখন পেটে বাচ্চা আসে লিটনকে জড়িয়ে সে যত কুৎসিত কথা বলা সম্ভব সবই বলতে থাকে। রাবেয়া বলে, আপা বিশ্বাস করেন হের মুখেই লিটনের আসার কথা শুনলাম, তহনও দেহি নাই। বাচ্চা হওয়ার চলিশ দিনের মাথায় একদিন মারতে মারতে ঘর থেকে বের করে দেয় স্বামী। রাবেয়া অজ্ঞান হয়ে বাইরেই পড়ে থাকে।

এরপর লিটন সামনে এসে দাঁড়ায়। হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওখান থেকে ফিরলে সালিশ বসিয়ে ওদেরকে জুতোপেটা করা হয়। তারপর সেই রাতেই পালায় দু'জনে। পালিয়ে ঢাকায় এসে মোহাম্মদপুরে আশ্রয় নেয়। লিটন কুলিগিরি করে আর রাবেয়া বিভিন্ন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। এ রকমই এক বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে সে সেলাইয়ের কাজ করার সুযোগ পায়। তাতে অনেক বেশি সচ্ছলতা আসে। কিন্তু সেও বেশিদিন সইল না। তার স্বামী খবর পেয়ে ঢাকায় এসে হম্বিতম্বি করে। রাবেয়াকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। না পেরে ওরা বিবাহিত না জানিয়ে বস্তির লোকদের ক্ষেপিয়ে দেয়। বস্তির লোকদের ভয়ে তখন ওরা পালিয়ে পালিয়ে থাকত।

রাবেয়া জানায়, তিনচারদিন পালি য়ে থেকে ওইদিনই সে গিয়েছিল তাদের ঘরটির অবস্থা দেখতে। আর সেই সময়টিতেই অরা গিয়েছিল কাপড় আনতে। কাকতালীয়ভাবে রাবেয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। অরা রাগারাগি করে চলে আসার পর ওই রাতেই লিটনকে বস্তির সামনে মেরেছে কারা যেন। রাবেয়া খবর পেয়ে ছুটে যায় সেখানে। এই ফাঁকে বাড়িটায় যা ছিল সব লুট করে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিয়েছিল বস্তির মানুষ। এরপর প্রাণ হাতে করে ওরা অন্য বস্তিতে পালিয়ে যায়। এখন সেখানেই আছে।

কিন্তু মনে শান্তি নাই আপা, বলে রাবেয়া। আবার কোন চেনা মানুষ খোঁজ পাইয়া খবর দিয়া দিব আবার পলান লাগব। ঢাকা শহরটাও গেরামের মতন ছোটই। গুছাইয়া সংসার করার কপাল হইল না।

রাবেয়া বস্তির এক লোকের কথা বলে। লোকটি কোন কাজ করে না। চারটে বিয়ে করেছে। বউদের উপার্জনে খায়। এক বউ গ্রামে থাকে চারপাঁচটি স ন্তানসহ, যাকে প্রথম সে বিয়ে করেছিল। গ্রামের বউ-ছেলেমেয়েকেও এই আয় থেকেই কিছুটা ভাগ দেয়। সেখানে বছরে দু'বার যায়। ঈদের সময় শহরের বুয়াবউরা প্ তিটি বাসা থেকে শাড়ি চুড়ি পায়, বাড়তি টাকা পায় সেখান থেকে কিছু তুলে নিয়ে সে গ্রামে যায় দায়িত্বশীল স্বামী হয়ে সন্তানসন্ততি নিয়ে ঈদ করতে। আর সারাবছর বস্তিতে একটি ছোট ঘরে এক বউ নিয়ে থাকে। বউটি সারাদিন ছুটা কাজ করে পাঁচছ 'টি বাসায়, ঘর সামলায়, স্বামী সেবা করে। আর বাকি দু'টি বউ বাঁধা কাজ করে দুই বাসায়। স্বামী মাস শেষে গিয়ে বেতন তুলে নিয়ে আসে। ওরাও মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আসে স্বামীর কাছে, থাকে বস্তির ওই একটি ঘরেই সতীনসহ। তখন দুই বউ স্বামীর দখল নেওয়ার জন্য স্বামী-সেবা করে প্রাণপণে আর নিজেরা তারস্বরে ঝগড়া করে। সবসময়ের সঙ্গিনী বাসাবাড়ি থেকে যে খাবারগুলো তাকে খেতে দেওয়া হয় সেখান থেকে ভালগুলো স্বামীর জন্য বেঁধে নিয়ে যায় নিজে না খেয়ে। তবু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার পরাজয় ঘটে। বরং সে মার খায়। সবচেয়ে বেশি সময় স্বামীকে পেয়েও কয়েকদিনের মেহমান সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হয় তাকে। শুধু এই লোকটি নয়, বস্তির ঘরে ঘরে নারীর প্রতি বৈষম্য আর অবমাননার হাজারো কাহিনি। অথচ এই লোকগুলোর শাস্তি পেতে হয় না। এরাই বরং রাবেয়া আর তার প্রেমিকের বিচারক!

রাবেয়া হু হু করে কাঁদে। আলভিকে বুকে চেপে আবার বলে, পোলাটার তরে বুক খালি খালি লাগে আপা।

অরা কী বলবে ওকে! কী সান্ত্বনা দেবে! এই ব্যথার কোন সান্ত্বনা কী হয়! তার নিজের বুকটাও মুচড়ে ওঠে।

রাবেয়ার ছেলেটা মা হারিয়ে কত কষ্টে আছে কে জানে! এই ছেলে তো এত ঘটনার কিছুই জানবে না, মায়ের এত কষ্টের কথা, প্রতি মুহূর্তে তড়পানোর কথাও জানবে না। শুধু জানবে মায়ের ওকে ফেলে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার কথা।

শাহনাজ নাসরীন ছোটগল্পকার

রাবেয়া হু হু করে কাঁদে। আলভিকে বুকে চেপে আবার বলে, পোলাটার তরে বুক খালি খালি লাগে আপা। অরা কী বলবে ওকে! কী সান্ত্বনা দেবে! এই ব্যথার কোন সান্ত্বনা কী হয়! তার নিজের বুকটাও মুচড়ে ওঠে। রাবেয়ার ছেলেটা মা হারিয়ে কত কষ্টে আছে কে জানে! এই ছেলে তো এত ঘটনার কিছুই জানবে না, মায়ের এত কষ্টের কথা, প্রতি মুহূর্তে তড়পানোর কথাও জানবে না। শুধু জানবে মায়ের ওকে ফেলে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার কথা।

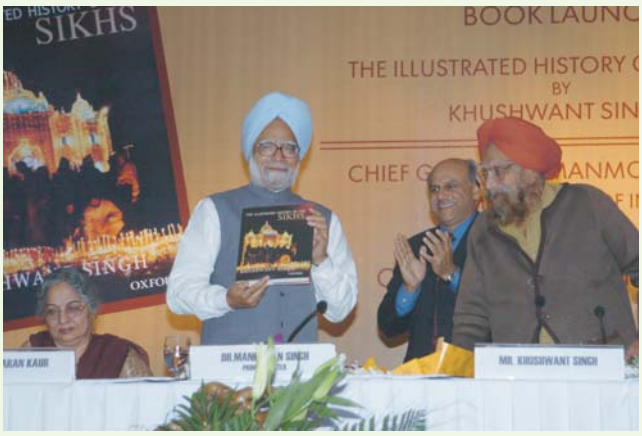

শেষপাতা

খুশবন্ত সিং

খুশবন্ত সিং
১৯১৫২০১৪

অনন্য ধর্মনিরপেক্ষ হাস্যরসিক, কবিতাপাগল, ইন্দোঅ ঢ্যাংলিয়ান ঔপন্যাসিক, আইনজীবী, রাজনীতিক ও সাংবাদিক খুশবন্ত সিংএর জন্ম অধুনা পাকিস্তানে অবস্থিত পঞ্জাবের খুশাব জেলার হাদলিতে এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারে। তাঁর পিতা স্যার শোভা সিং ছিলেন *লুটিয়েন দিল্লির* নির্মাণসহ যোগী, কাকা সরদার উজ্জ্বল সিং ছিলেন পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর প্রাক্তন গভর্নর।

নতুন দিল্লির মডার্ন স্কুল, লাহোর সরকারি কলেজ ও দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস্ কলেজ ও লন্ডনের কিংস কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে খুশবন্ত লন্ডনের ইনার টেম্পলএ বার এট্ ল স স্পন্ন করেন।

লন্ডনপ্রত্যাগত খুশবন্ত ১৯৩৮ সালে লাহোর হাই কোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেখানে ৮ বছর প্রাকটিসের পর ১৯৪৭এ দেশ ভাগ হলে তিনি সদ্যস্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র দফতরে যোগ দেন এবং টরেন্টোয় ভারত সরকারের তথ্য কর্মকর্তা পদে আসীন হন। তিনি লন্ডন ও অটোয়ায় ভারতীয় হাই কমিশনে প্রেস এ্যাটাশে ও গণসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে ৪ বছর কাটিয়ে ১৯৫৪ '৫৬ সালের মধ্যে প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে গণসংযোগ বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি সংবাদপত্র জগতে পা রাখেন ভারত সরকারের সাময়িকী *যোজনার* সম্পাদক হিসেবে। পরে *ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া* সংবাদসা প্তাহিকীতে সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৬৫ হাজার থেকে ৪ লাখে উন্নীত হয়। ৯ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করে অবসর গ্রহণের মাত্র ১ সপ্তাহ আগে ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই তিনি কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে বরখাস্ত হন। খুশবন্তের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার প্রচার সংখ্যায় ধস নামে।

প্রতিদিন ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে খুশবন্ত লেখালেখি শুরু করতেন। তাঁর লেখালেখির পরিধি রাজনৈতিক কলাম, সমসাময়িক শ্লেষ এবং শিখ ধর্ম ও উর্দু কবিতার অনবদ্য অনুবাদ পর্যন্ত বিস্মৃত ছিল। *একজন ও সকলের প্রতি বিদ্বেষ* শীর্ষক কলামে তাঁর শান্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের একজন যিনি উর্দু ও পঞ্জাবি কব্লি লেখকদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং তাঁর কলামে সদ্যপ্রয়াত সমসাময়িকদের সম্পর্কে লিখতেন।

অজ্ঞেয়বাদী হলেও খুশবন্ত ধর্মের অনেক খুঁটিনাটি এবং মানব জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি মুহম্মদ ইকবালের দীর্ঘ কবিতা *শিকোয়া* (১৯০৯) এবং *জবাব্লই শি কোয়া*(১৯১৩)র ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর কলামে তিনি অনেক অনামা উর্দু কবিকে পরিচিত করিয়ে দেন, একইসঙ্গে তিনি ভারতে উর্দু ভাষার জন্যে দেবনাগরি বা ল্যাটিন হরফের সুপারিশ করেন।

১৯৮৭ '৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯৭৪ সালে পান *পদ্মভূষণ* কিন্তু '৮৪ সালে স্বর্ণ মন্দিরে সেনা অভিযানের প্রতিবাদে তিনি সে খেতাব ফিরিয়ে দেন। পরে ২০০৭ সালে ভারত সরকার আবার তাঁকে *পদ্ম বিভূষণ* খেতাবে ভূষিত করেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় খুশবন্ত কংগ্রেসের, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক ছিলেন– কিন্তু শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর প্রাণ বিসর্জনের পর দেশব্যাপী শিখ্বি রোধী দাঙ্গায় তিনি কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তবু ভারতীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল খুশবন্ত দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী এইচ এস ফুলকাণ্ডর সংগঠন সিটিজেনস্ জাস্টিস কমিটির সঙ্গে কাজ করেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক– অনেকগুলি বইয়ের জনক খুশবন্ত ২০১১ সালে *এগনোস্টিক খুশবন্ত: দেয়ার ইজ নো গড* এবং ২০১৩ সালে *দি গুড দি ব্যাড এন্ড দি রিডিকিউলাস* নামে দু'টি বই লেখেন। তিনি প্রথাগত সব রকম ধর্মের বিরোধী ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে খুশবন্ত সিং কবল মালিককে বিবাহ করেন। তাঁদের এক পুত্র রাহুল ও এক কন্যা মালা। ২০ মার্চ ২০১৪ দিল্লির সুজান সিং পার্ক্এর বাসভব নে এই বিদগ্ধ সাহিত্যিক্সাংবাদিক দেহরড়্গা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে ঝুমা খন্দকার শর্মিষ্ঠার সঙ্গীতসন্ধ্যা ॥ ৭ মার্চ একই মিলনায়তনে অনিলকুমার সাহার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন

৮ মার্চ ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে নভীদ মাহবুব ও বন্ধুদের কমেডি পরিবেশন ॥ ১৪ মার্চ শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে আইজিসিসির ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধন

১৫ মার্চ ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে ভারতের সৌমেন অধিকারীর সঙ্গীতসন্ধ্যা ॥ ২১ মার্চ ২০১৪ একই মিলনায়তনে শহীদ কবির পলাশের নজরুলসঙ্গীত পরিবেশন

২২ মার্চ ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে মহাদেব ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ॥ ২৯ মার্চ একই মিলনায়তনে কুমার মারদুরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra April 2014

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উল্লেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত